মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

সত্যই ভগবান

গান্ধী স্মারক নিধি

।। বাংলা শাখা ।।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

সত্যই ভগবান

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ অনূদিত

গান্ধী স্মারক নিধি
বাংলা

'**Satyai Bhagaban**' is the Bengali translation of 'Truth is God', a collection of writings of Mahatma Gandhi bearing on God, God-realization and the Godly Way, compiled by R. K. Prabhu and published by the Navajivan Trust of Ahmedabad. The book will help clear spiritual doubts, set the mind firmly on the divine path and supply the much-needed remedy for all ills arising out of non-belief or the atrophy of the spirit.

Published by the permission of the Navajivan Trust

প্রকাশক : শ্রীশক্তিরঞ্জন বসু
সম্পাদক, গান্ধী স্মারক নিধি (বাংলা),
১৪ রিভারসাইড রোড,
বারাকপুর (২৪-পরগনা)

দ্বিতীয় সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৭১ (জুলাই ১৯৬৪)
প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯ (জুন ১৯৬২)

মূল্য : তিন টাকা

মুদ্রক : শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস
ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং প্রাইভেট লিঃ
২৮ বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৯

ভূমিকা

নবজীবন প্রকাশনের কার্যাধ্যক্ষ চলতি রেওয়াজের তথা ভ্রমের মোহ এড়াইতে পারেন নাই। ধর্ম ও ভগবান সম্পর্কে গান্ধীজীর লেখার সংকলন-গ্রন্থের জন্য প্রস্তাবনা লিখিয়া দিতে আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। এরূপ যে বিষয় আর এতাদৃশ যার রচয়িতা, তার জন্যও মুখবন্ধ! ভূমিকার বুভুক্ষা সংবরণ করিলে ভাল হইত। কিন্তু ফ্যাশনের আকর্ষণ এমন মোহক যে এ সব সত্ত্বেও অন্য দশ জনে যা করে তিনিও তা করিয়াছেন—আমাকে গুটি দুই কথা লিখিতে বলিয়াছেন।

ভগবান তথা ধর্মবিশ্বাস সুস্থ সহজ জীবনের ভিত্তিস্বরূপ, তা ছাড়া না চলে ব্যক্তির, না চলে সমাজের। একান্ত পরিণত বয়সের ত্রিশ বৎসর কালব্যাপী গান্ধীজী নানা প্রসঙ্গে অন্তরের গভীর হইতে যে কথা বলিয়াছেন এই পুস্তকে পাঠক তাহা পড়িতে পাইবেন। অনেক মহান্ কর্মের নায়ক এই যুগেরই একজ ব্যক্তি ভগবান ও ধর্ম সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন তাহা হইতে সমস্যাসংকুল এই যুগের শিক্ষিত নরনারী নিশ্চয় লাভবান হইবেন।

"মানব গোষ্ঠীর সকলে আমরা দার্শনিক নহি। এক ভাবে না এক ভাবে এমন কিছু না হইলে আমাদের চলে না যাহা আমরা চোখে দেখিতে পারি, হাতে স্পর্শ করিতে পারি, যাহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে পারি—তাহা বইই হোক আর পাথরে-তৈরী গৃহ, শূন্য বা মূর্তিসংবলিত।" বিভিন্ন ধর্মমতের মনোভাব দৃষ্টে গান্ধীজী দেউলে দেব-পূজার সমর্থনে এ কথা বলিয়াছেন।

আর হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "হিন্দুধর্ম বিশাল মহাসাগরের ন্যায় রত্নগর্ভা। যত গভীরে ডুবিবেন তত রত্নরাজি পাইবেন।"

জাতির জনক কীরূপ মানুষ ছিলেন তাহা যিনি জানিতে ইচ্ছুক এই গ্রন্থ তাঁহার অবশ্যপাঠ্য। আমাদের শাস্ত্রে অথবা অন্য সব ধর্মগ্রন্থে যাহা নাই, ধর্ম সম্বন্ধে সে সব কথা শোনার আগ্রহ সকলের না থাকিতে পারে। কিন্তু আমাদের আদরের ধন, জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন এক মহাপুরুষের মনের ক্রিয়ার একটা দিক এখানে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। উহার ধর্মোপদেশের অতিরিক্ত স্বতন্ত্র মূল্য রহিয়াছে।

মাদ্রাজ, ১১. ৪. '৫৫ — **সি. রাজাগোপালাচারী**

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

'সত্যই ভগবান' প্রকাশিত হল। এটি গান্ধীজীর ধর্ম সম্বন্ধীয় চিন্তাধারার সংকলন নবজীবন প্রকাশিত 'Truth is God' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট গান্ধীবাদী লেখক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ।

গান্ধীজীর চোখে সত্য আর ভগবান সমীকৃত ছিল। তিনি সত্যকেই ভগবানের পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। লোকে বলে 'ভগবান সত্য'; তিনি বলতেন 'সত্যই ভগবান'। সত্য আর ভগবানের এই সমীকরণের পশ্চাতে গান্ধীজীর মনে কোন্ ভাবধারা ক্রিয়াশীল ছিল তার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে এই বইখানিতে। ধর্ম ও ধর্মপথ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্রের পক্ষে এই গ্রন্থ এক অমূল্য চিন্তারাজির আকর স্বরূপ। প্রসঙ্গত মহাত্মাজী এই গ্রন্থে রামনাম, প্রার্থনার সার্থকতা, প্রাকৃতিক চিকিৎসা, ব্রহ্মচর্য, হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্ট ও ইসলাম ধর্মের চিন্তাধারায় সাদৃশ্য প্রভৃতি ধর্ম বিষয় সংশ্লিষ্ট বিচিত্র প্রসঙ্গের আলোচনা করেছেন। এই আলোচনাগুলির মাধ্যমে ব্যক্তিজীবনে যথাযথ পথে চলবার মূল্যবান সংকেত পাওয়া যাবে। জীবনে আধ্যাত্মিক সংকট দেখা দিলে কেমন করে তা উত্তীর্ণ হওয়া যায় তার নির্দেশও এই রচনাগুলির মধ্যে রয়েছে। সুতরাং নানা দিক থেকে এই বইটি জিজ্ঞাসু মনের সহায়ক।

বর্তমানে দেশে একপ্রকারের ধর্মীয় নৈরাজ্য চলছে। 'সত্যই ভগবান' গ্রন্থটির দ্বারা যদি এই সর্বব্যাপী ধর্মবোধের অভাবের মধ্যে কিছু পরিমাণেও ধর্মানুভূতির জাগরণ ঘটানো যায় তা হলেই এ গ্রন্থের প্রচারণা সার্থক।

শ্রীশক্তিরঞ্জন বসু

বিষয়-সূচী

প্রকরণ	পৃষ্ঠা

গান্ধী স্মারক নিধি (বাংলা)-র প্রকাশিত গ্রন্থ

গান্ধীজীর ন্যাসবাদ	০.৫০
সর্বোদয় ও শাসনমুক্ত সমাজ	২.৫০
গীতাবোধ	১.৫০
নারী ও সামাজিক অবিচার	৪.০০
পল্লী-পুনর্গঠন	৩.০০
পঞ্চায়েত রাজ	০.৭৫
কর্মের সন্ধান	০.৭৫
মহাত্মা গান্ধী (জীবনী)	৬.৫০
	৫.৫০
সর্বোদয়	২.৫০
অছিবাদ	০.৬২
উৎপাদক শ্রম	০.৬০

১

সত্যানুসন্ধানে

আমি সত্যের সাধকমাত্র। বলিতে পারি যে, সত্যোপলব্ধির এক পথ আমি পাইয়াছি। এ কথাও বলিতে পারি যে, সত্যোপলব্ধির নিরন্তর প্রযত্ন আমি করিতেছি। কিন্তু আজও আমার সত্যোপলব্ধি হয় নাই এ কথা আমি স্বীকার করি। সত্যের সম্যক্ দর্শন মানে আত্মোপলব্ধি, জীবনের অন্তিম লক্ষ্য-প্রাপ্তি তথা পূর্ণতা লাভ। সখেদে স্বীকার করি, নানা ত্রুটি আমার আছে। তবে সে বিষয়ে আমি সচেতন আর এই অনুভবই আমার সকল শক্তির মূল আধার; কেননা নিজ ত্রুটি-বিচ্যুতির বিষয়ে মানুষ প্রায় সর্বক্ষেত্রে উদাসীন।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৭-১১-২১]

বলিতে সংকোচ নাই যে, যদি পূর্ণ হইতাম তবে প্রতিবেশীর দুঃখে এমনটা বেদনা-বিহ্বল আমাকে হইতে হইত না। সে অবস্থায় দুঃখ নিরূপণ করিয়া উহার প্রতিকারের পথ নির্দেশ করিতাম আর অন্তরে নিহিত সত্যের অপ্রতিহত প্রভাবে তদনুরূপ কার্য হইয়া যাইত। কিন্তু অদ্যাবধি সত্যের যে দর্শন লাভ হইয়াছে তাহা দর্পণে প্রতিফলিত ছায়ার ন্যায় অস্পষ্ট আর তাই নানা কষ্টসাধ্য মন্থর উপায়ে লোককে বুঝাইতে হইতেছে। তাহাও যদি সব সময় সফল হইত! এই অবস্থায় দেশব্যাপী এই সব প্রতিকারসাধ্য দুঃখদৈন্যের কথা জানা সত্ত্বেও, সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বরের ছায়াতলে কঙ্কালসার অগণিত নরনারী দেখার পরেও তাহাদের দুর্দশায় যদি আমার হৃদয় না গলিত, আকুল না হইত, তবে তো আমি অ-মানুষ হইয়া যাইতাম।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৭-১১-২১]

পূর্ণ শুদ্ধ, পূর্ণ সত্যসন্ধ আমি হইতে চাই, কায়মনোবাক্যে অহিংস হইতে চাই—অকিঞ্চনের ইহা আকুল আকূতি। কিন্তু যে আদর্শ স্থিতিকে আমি সত্য বলিয়া জানি সেই অবস্থায় পৌঁছিতে পারিতেছি না, বারংবার ব্যর্থকাম হইতেছি। এই আরোহণ-প্রচেষ্টা ক্লেশদায়ক তো বটেই কিন্তু ওই ক্লেশ আমার কাছে ক্লেশ নয়, তাহা আনন্দের খনি। প্রতি পদক্ষেপে আমার শক্তি বাড়িতেছে ও পরবর্তী পদক্ষেপ সুগম হইতেছে, ইহা আমি অনুভব করি।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৯-৪-২৫]

পথের সন্ধান পাইয়াছি। ঋজু সেই পথ, সঙ্কীর্ণ সেই পথ। অসি-ফলকের ন্যায় উহা খরধার। উহার উপর দিয়া চলিতে আমার ভাল লাগে। পদস্খলনে হয়ত অন্তর কাঁদিয়া উঠে। ভগবান বলেন, 'যত্নপরায়ণের কভু বিনাশ নাই'। ভগবানের এই আশ্বাসবাণীতে আমার বিশ্বাস অবিচল। দুর্বলতার দরুন বারংবার অকৃতকার্য হই কিন্তু হতাশ হই না বরং এই আশায় বুক বাঁধিয়া চলি যে বাসনা যখন পূর্ণ বশে আসিবে—আর এক দিন আসিবেই—তখন সেই জ্যোতির্ময়ের দর্শন পাইব।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৭-৬-২৬]

তাঁর দর্শনলাভ আমার হয় নাই ; উপলব্ধিও হয় নাই। জগতের সব লোকে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। তাহাদের সেই বিশ্বাসকে আমি আপন পাথেয় করিয়া লইয়াছি। সেই বিশ্বাস এতই নিবিড় যে তাহা অনুভূতিরই তুল্য। কিন্তু বিশ্বাসকে অনুভূতি বলিলে সত্যের হানি হয় এ প্রশ্ন উঠিতে পারে। তাই এ কথা বলাই ভাল হইবে যে, আমার ভাগবত বিশ্বাসের স্বরূপ যে কি তাহা ব্যক্ত করার ভাষা আমার নাই।

[আত্মকথা (১৯৪৮), পৃঃ ৩৪১]

আশৈশব আমি সত্যের পূজারী। তাহা আমার সর্বাধিক স্বাভাবিক বৃত্তি। হৃদ্‌গত সাধনার ফলে 'ভগবানই সত্য'—প্রচলিত এই সূত্রবাক্যের জায়গায় 'সত্যই ভগবান' জ্ঞানোন্মেষী এই সিদ্ধবাক্য আমার লাভ হইয়াছে। এই দিব্য অনুভব সহায়ে ভগবানকে যেন সাক্ষাৎ দেখিতে পাইতেছি, তাঁর অস্তিত্ব দেহের অণু-পরমাণুতে অনুভব করিতেছি।

[হরিজন, ৯-৮-৪২]

অহিংসা আমার ভগবান ; সত্য আমার ভগবান। অহিংসার দিকে ফিরি তো সত্য আমায় বলে, 'অহিংসার সাধনা করবে তো আমার শরণ নাও।' আর সত্যের দিকে তাকাই তো অহিংসা বলে, 'সত্যের দর্শন চাও তো আমার আশ্রয় নাও।'

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৪-৬-২৫]

সত্যের সর্বব্যাপ্ত মূর্ত বিশ্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে হইলে সৃষ্টির অধমতম জীবকে নিজের মত ভালবাসিতে হইবে। এরূপ মুমুক্ষু ব্যক্তি জীবনের কোন ক্ষেত্র হইতেই দূরে সরিয়া থাকিতে পারে না। তাই সত্যের সাধনাসূত্রেই আমাকে রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইয়াছে। আর এ কথাও নিঃসংশয়ে অপিচ নিরতিশয় বিনয়ে বলিব যে, যাঁহারা বলেন রাজনীতিতে ধর্মের স্থান নাই, ধর্ম যে কি তাহা তাঁহারা জানেন না।

[আত্মকথা (১৯৪৮), পৃঃ ৬১৫]

মানুষের সেবার মাধ্যমে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভের প্রযত্ন আমি করিতেছি। তাহার কারণ, ভগবান স্বর্গেও নহেন, মর্ত্যেও নহেন ; ভগবান মানবমাত্রে বিদ্যমান।

[আত্মকথা (১৯৪৮), পৃঃ ৬১৫]

নশ্বর জগতের অধিরাজ্যে আমার অভিরুচি নাই। অমৃতত্ব লাভের সাধনায় আমি নিরত। আর তাহাই মোক্ষ। এই লক্ষ্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত কন্দরবাসী হওয়ার আবশ্যকতা নাই। আমার অন্তরেই সেই গিরিকন্দর বিদ্যমান এ কথাটা জানিলেই হইল। গুহাবাসীর পক্ষে বাসনার অনন্ত জাল বোনা বিচিত্র নয়। কিন্তু প্রাসাদ-নিবাসী জনকের বিষয়-বাসনার ইন্দ্রপুরী রচনা করিতে হয় না। মন বিষয়-বাসনার আনাচে-কানাচে ঘুরিয়া বেড়ায় তো কন্দরবাসী হইয়াও শান্তি নাই। জাঁকজমক ও ঘটার মধ্যে থাকিয়াও জনক অপার শান্তি লাভ করিতে পারেন। দেশবাসীর তথা জগতবাসীর নিরন্তর সেবাকেই আমি মোক্ষ লাভের পথ বলিয়া জানি। জীবমাত্রের সহিত সমত্ব উপলব্ধি আমার কাম্য।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩-৪-২৪]

কেবল মনুষ্যনামধারী জীবের সঙ্গেই নয়, জীবমাত্রের সঙ্গে, এমন কি বুকে হাঁটিয়া চলে যে কৃমিকীট উহার সঙ্গেও সমত্ব অনুভব করিতে আমি প্রয়াসী। কৃমিকীটের সহিত সমত্ব অনুভব করিতে চাই এ কথায় সম্ভবত আপনারা ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিবেন। তবু যে এ কথা বলি তাহার কারণ, একই ঈশ্বর হইতে সব কিছুর উৎপত্তি এ কথাই না আমরা বলি। তাহা যদি হয় তো সকল জীব—রূপ তাহাদের যেমনই হোক—মূলত একই।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৪-৪-২৯]

গান্ধীবাদ বলিয়া কিছু নাই। সম্প্রদায় আমি রাখিয়া যাইতে চাই না। কোন নূতন তত্ত্বের, নূতন ধর্ম প্রবর্তনের দাবি আমি করি না। দৈনন্দিন জীবন-ব্যাপারে ও বিবিধ সমস্যার সমাধান কল্পে শাশ্বত সত্যসমূহের প্রয়োগ-পরীক্ষা আমার দৃষ্টি অনুসারে আমি

চালাইয়াছি মাত্র। সত্য ও অহিংসা অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। এই দুইয়ের প্রয়োগ-পরীক্ষা যতটা ব্যাপক ক্ষেত্রে সম্ভব ততটা ব্যাপক ক্ষেত্রে চালাইয়াছি মাত্র। এই সব প্রয়োগ-পরীক্ষায় সময় সময় আমার ভুল হইয়াছে ঃ ঠেকিয়া আমি শিখিয়াছি। এভাবে জীবন ও জীবনের নানা সমস্যা আমার কাছে সত্য ও অহিংসার সাধনার পরীক্ষা-ক্ষেত্র হইয়া গিয়াছে।

[হরিজন, ২৮-৩-৩৬]

সত্য ও অহিংসায় আমার বিশ্বাস দিন দিন বাড়িতেছে। এই দুইয়ের আচরণ সতত আমি জীবনে করিতেছি আর যে পরিমাণে করিতেছি সে পরিমাণে সতত আমি আগাইয়া চলিয়াছি। নিত্য নূতন অর্থের সন্ধান পাইতেছি, নিত্য নূতন আলো দেখিতে পাইতেছি আর নিত্য নব ভাব।

[হরিজন, ২-৩-৪০]

২

ভগবান আছেন

এক সর্বব্যাপী অবর্ণনীয় রহস্যময় শক্তি বিদ্যমান। দেখিতে না পাইলেও তাহা আমি অনুভব করি। এই সেই অব্যক্ত শক্তি যাহা নিজ অস্তিত্বের কথা জানাইয়া দেয় অথচ যাহা প্রমাণ করার উপায় নাই, কারণ তাহা আদৌ কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর মত নয়। তাহা ইন্দ্রিয়াতীত।

কিন্তু বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা তাঁর অস্তিত্বের কল্পনা কতকটা করা যায়। জীবনের সাধারণ ক্ষেত্রেও দেখিতে পাই যে, কে শাসন করে কেন করে আর কিভাবে করে সে খবর লোকে রাখে না। তবু কোন

এক শক্তি যে নিশ্চিত শাসন করে এ কথাটা তাহারা জানে। গত বছর মহিশূর পরিক্রমা কালে গ্রামবাসীদের সহিত কথাপ্রসঙ্গে দেখিতে পাই যে কে যে তাহাদের শাসক তাহা তাহারা জানে না। কোন দেবতা হবে, এমনটাই তাহারা বলিয়াছিল। নিজেদের শাসক সম্পর্কে এই বেচারাদের বোধ এতটাই সীমাবদ্ধ। তাহাদের শাসকের তুলনায় তাহারা যতটা ক্ষুদ্র, ভগবানের তুলনায় তার চাইতে আমি অনন্ত গুণ ক্ষুদ্র। সে স্থলে ভগবানের, রাজাধিরাজের সান্নিধ্য যদি আমি উপলব্ধি করিতে না পারি তো আশ্চর্যের কি আছে। তাহা হইলেও বেচারা গ্রামবাসীরা মহিশূর সম্পর্কে যেরূপ মনে করে আমিও তেমনি অনুভব করি যে বিশ্বে এক ব্যবস্থাপনা বর্তমান; সকল বস্তু, সকল জীব এক অলঙ্ঘনীয় বিধি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। উদ্দেশ্য-হীন জড় বিধি তাহা নয়, কারণ অজীব বিধি সজীব প্রাণীর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করিতে অপারগ। আর আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বিস্ময়কর গবেষণার ফলে আজ তো এ কথাও সপ্রমাণ করা সম্ভব হইয়াছে যে বস্তুমাত্রেরই জীবন আছে। অতএব সর্বনিয়ন্তা সেই বিধিই ভগবান। বিধি ও বিধাতা অভিন্ন। বিধি অথবা বিধাতা সম্পর্কে আমার জ্ঞান এত অল্প যে তাহা বা তাঁহাকে অস্বীকার করা আমার সাজে না। রাজশক্তির অস্তিত্বে অবিশ্বাস বা অজ্ঞতা যেমন কাজের কথা নয়, তেমন ভগবান ও তাঁর বিধি অস্বীকার করিয়া লাভ নাই, তাহাতে তাঁর বিধান হইতে নিষ্কৃতি নাই। উল্টা, ভগবানের কর্তৃত্ব বিনা বিচারে নম্রভাবে মানিয়া লইলে জীবন-পথ সমধিক সুগম হয়, যেমন সুগম হয় যে-রাজসত্তার অধীনে আছি সে-রাজসত্তা মানিয়া লইলে।

আমার চারিদিকে এই যে নিরন্তর ভাঙ্গা-গড়া ও মৃত্যুর খেলা চলিতেছে উহার অন্তরালে এক প্রাণবন্ত অব্যয় শক্তির অস্তিত্ব আমি আবছায়ার মত অনুভব করি। তাহা সব কিছু ধারণ করে, সৃজন করে, সংহার করে ও পুনরায় সৃজন করে। এই প্রেরক শক্তি বা অশরীরী

সত্তাই ভগবান। স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সব কিছু নশ্বর, বিনাশশীল; একমাত্র তিনিই অবিনশ্বর।

এই শক্তি মঙ্গলময় কি অমঙ্গলময়? আমি তো দেখি, তাহা পূর্ণ মঙ্গল-নিধান। কারণ মৃত্যুর কোলে জীবনের স্পন্দন, অসত্যের মধ্যে সত্যের প্রকাশ ও অন্ধকার মধ্যে আলোর বিকিরণ দেখিতে পাই। ইহা হইতে অনুমান করি যে, ভগবানই জীবন, সত্য ও আলোক। তিনি প্রেমময়, পরম কল্যাণ-নিধান।

যে ভগবান কেবল বুদ্ধিকে তৃপ্ত করে, আদৌ করে তো, সে ভগবান ভগবান নহে। তিনিই ভগবান যিনি হৃদয় স্পর্শ করেন, উহার রূপান্তর ঘটান। উপাসকের তুচ্ছ কর্মটিতে পর্যন্ত তাঁর রূপ ফুটিয়া উঠা চাই। তার জন্য চাই সুনিশ্চিত খাঁটি অনুভব, যাহা পঞ্চেন্দ্রিয় হইতে কখনও মিলিবার নয়। যতই সত্য মনে হোক ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভব মিথ্যা ও ছলনাময় হইতে পারে আর অনেক সময় তাহাই বটে। ইন্দ্রিয়াতীত অনুভবই কেবল নির্ভুল। ভগবানের যথার্থ সান্নিধ্য যাঁহারা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের পরিবর্তিত আচরণ ও চরিত্র ইহার একমাত্র প্রমাণ, অন্য কোন বাহ্য প্রমাণ নাই।

সর্বদেশে সর্বযুগে যে সকল মহাপুরুষ ও সাধুব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ইহার প্রমাণ। এই প্রমাণ অগ্রাহ্য করার অর্থ নিজেকে হারাইয়া ফেলা।

অবিচল বিশ্বাস হইতে এই অনুভব আসে। এই দেহেই কেহ ভগবানকে সাক্ষাৎ অনুভব করিতে চায় তো তার জন্য চাই জ্বলন্ত বিশ্বাস। আর বিশ্বাস বস্তুটির নিজেরই কোন বাহ্য প্রমাণ নাই বলিয়া জগত-ব্যাপার নৈতিক নিয়মবশে চলিতেছে অর্থাৎ নীতি-ধর্মের, সত্য-ধর্মের ও প্রেম-ধর্মের প্রাধান্য চলিতেছে এ কথা মানিয়া লওয়াই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ পন্থা। যাহা সত্য ও প্রেমের বিরোধী, তাহা নির্মমভাবে বর্জন করার দৃঢ়তা থাকিলেই কেবল বিশ্বাসের উপর নির্ভয়ে নির্ভর করা চলে।

অমঙ্গল কেন যে আছে তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত হেতু আমি খুঁজিয়া পাই না। তাহার কারণ নির্ধারণ করিতে যাওয়া মানে ভগবানের তুল্য বনা। অতএব অমঙ্গলকে অমঙ্গল বলিয়া মানিয়া লইতে আমার বাধে না ; এই নম্রতা আমার আছে। আর ভগবান জগতে অমঙ্গল হইতে দেন তাই না আমি তাঁকে পরম সহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল বলি। আমি জানি তাঁতে কোন অমঙ্গল নাই। অমঙ্গল তাঁরই সৃষ্টি তবু তিনি অলিপ্ত।

এ কথাও আমি জানি যে, যদি জীবন পণ করিয়া অমঙ্গলের বিরুদ্ধে না দাঁড়াই, উহার সহিত না লড়ি তো ভগবানকে জানা যাইবে না। নিজ অভিজ্ঞতা (হোক না তাহা নগণ্য ও অত্যল্প) হইতে আমার বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে। নিষ্পাপ হওয়ার যত বেশী চেষ্টা করি তত অধিক তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করি। আজ তো আমার বিশ্বাস বিশ্বাসের নামযোগ্যই নয় ; তাহা যখন হিমালয়ের মত অটল হইবে, উহার তুষারমণ্ডিত শিখরের মত শুভ্র, স্বচ্ছ হইবে তখন তাঁর কত কাছেই না আমি পৌঁছিয়া যাইব। ইত্যবসরে পত্র-লেখককে নিউম্যানের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া তাঁহার অনুভবলব্ধ গান গাহিতে বলি ঃ

অন্ধকার ঘোরে, নিয়ে চলো মোরে,
প্রেমল জ্যোতির্ময়, নিয়ে চলো মোরে।
রজনী ঘোর, নিবাস দূর,
প্রেমল জ্যোতির্ময়, নিয়ে চলো মোরে।
চাই না দূরের ইষ্ট, এক পদে দাস তুষ্ট,
দেখো, নাহি যেন পড়ি খাতে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১১-১০-২৮]

৩

এক তিনিই আছেন

আমার কাছে ভগবান সত্যস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ ; ভগবানই ন্যায় আর নীতিও তিনি ; ভগবান অভয়। ভগবান জ্ঞান ও প্রাণের আদি কারণ, তাহা হইলেও তিনি এ সবের অতীত ও উপরে। ভগবানই বিবেক। নাস্তিকের তিনি নাস্তিকতা। নাস্তিকেরও স্থান জগতে আছে এমনি অপরিসীম তাঁর প্রেম। ভগবান অন্তর্যামী। বাণী ও বুদ্ধির তিনি অতীত। আমাদের অপেক্ষা তিনি আমাদের বেশী জানেন ; আমাদের অপেক্ষা তিনি আমাদের অন্তরের খবর বেশী রাখেন। আমাদের কথায় তাঁর বিশ্বাস নাই, কেননা অনেক সময়েই আমরা কথার উল্টাটা করি—কেহ বা জ্ঞাতসারে, কেহ বা অজ্ঞাতসারে। যাহারা তাঁর সাক্ষাৎকারের অভিলাষী তাহাদের কাছে তিনি ব্যৈক্তিক ভগবান। যাহারা তাঁর স্পর্শন-ভিখারী তাহাদের কাছে তিনি সাকার ভগবান। পরম পবিত্র ওঁকার তিনি। তিনি আছেন, বস্, আস্থাবান কৃতকৃতার্থ। যে যেমন চায়, তাহার কাছে তিনি তেমন। তিনি আমাদের অন্তরে, তাহা হইলেও আমাদের অতীত, নাগালের বাইরে। কংগ্রেস হইতে 'গড' (ভগবান) কথাটি হটাইয়া দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু তাঁর অস্তিত্ব বিলোপ করার সাধ্য কাহারও নাই। 'সলেম এফারমেশন' (নিবেদিত চিত্তে বলিতেছি) আর 'ইন্ দ্য নেম্ অব গড' (ভগবানের নামে বলিতেছি) যদি একই না হয় তবে 'নিবেদিত চিত্তে বলার' মূল্য কি ? আর তিন অক্ষরে লিখিত বিবেক যে God (ঈশ্বর)-এর অপকৃষ্ট ও কষ্টকল্পিত অনুবাদ এ কথায় সংশয়মাত্র নাই। ঈশ্বরের নামে লোকে নানা বীভৎস কার্য, অকথ্য নিষ্ঠুরতা করে বলিয়া ভগবান নাই এ কথা মনে করা ভুল। তিনি অশেষ সহিষ্ণু। তিনি শান্তসমাহিত আবার

তেমনি ভয়ঙ্কর। তাঁর মত কড়ায়-ক্রান্তিতে উসুলকারী ইহকালে, পরকালে আর কেহ নাই। প্রতিবেশী জীবজন্তুর প্রতি যে ব্যবহার আমরা করি ঠিক সেই ব্যবহার তিনি আমাদের প্রতি করেন। অজ্ঞতার দোহাই দিয়া তাঁর হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই। আবার তাঁর মত ক্ষমাশীলও নাই, কারণ অনুতাপে পাপক্ষালন করার সুযোগ দেওয়ার জন্য তিনি সদা-প্রস্তুত। তাঁর চাইতে বড় গণতন্ত্রী আর নাই, কারণ ভাল-মন্দ বাছিয়া লওয়ার অবাধ অধিকার তিনি দিয়া রাখিয়াছেন। তাঁর মত স্বৈরাচারীও কেহ কখন দেখে নাই। কারণ আমাদের মুখে-তোলা গ্রাস তিনি যখন-তখন কাড়িয়া লন এবং ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্যের নামে যে স্বাতন্ত্র্য তিনি আমাদের দেন তাহা যে কত নগণ্য তাহা দেখিয়া তিনি নিজেই কৌতুক উপভোগ করেন। তাই তো হিন্দুধর্মে একে তাঁর লীলা, তাঁর মায়া বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আমাদের সত্তা নাই, একমাত্র তাঁরই আছে। সত্তা চাই তো অনন্তকাল ধরিয়া তাঁর যশোগান ও কর্ম করিতে হইবে। আসুন, তাঁর বংশীর তালে তালে নৃত্য করি। সর্বাঙ্গীণ ইষ্ট তাহাতে লাভ হইবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৫-৩-২৫]

অদ্বৈত ও ভগবান

[জনৈক বন্ধুর প্রশ্নোত্তরে গান্ধীজী লিখেন]

আমি অদ্বৈতী। তাহা হইলেও দ্বৈতের সমর্থন করিতে আমার বাধে না। জগৎ ক্ষণে ক্ষণে বদলাইতেছে; সুতরাং তাহা মিথ্যা, স্থায়িত্বরহিত। নিয়ত পরিবর্তনশীল হইলেও এর মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা অবিনাশী আর তাই সেই পরিমাণেই জগৎ সত্য। অতএব জগতকে সত্য ও মিথ্যা বলিতে আমার আপত্তি নাই; তার জন্য লোকে আমাকে অনেকান্তবাদী বা স্যাদ্‌বাদী বলে বলুক। কিন্তু

আমার স্যাদ্‌বাদ পণ্ডিতদের স্যাদ্‌বাদ নহে, তাহা একান্তই আমার নিজস্ব। তাঁহাদের সঙ্গে তর্কে আমি প্রবৃত্ত হইব না। আমার অভিজ্ঞতা এই যে, আমার দৃষ্টিমতে আমি সব সময়ই ঠিক আর আমার সৎ সমালোচকদের দৃষ্টিতে আমি প্রায় বহুক্ষেত্রেই অঠিক। আমি জানি যে নিজ নিজ দৃষ্টি হইতে উভয়েই আমরা ঠিক। আর এ কথা জানি বলিয়া প্রতিপক্ষের বা সমালোচকদের উপর অভিপ্রায় আরোপ করি না; অন্যথায় করিতাম। সাত জন অন্ধলোক সাত ভাবে হাতির রূপ বর্ণনা দিয়াছিল। নিজ নিজ বিচার অনুসারে তাহারা সবাই ঠিক বলিয়াছিল আর একে অন্যের বিচারে সবাই ভুল করিয়াছিল এবং হাতি দেখিয়াছে এমন লোকের বিচারে তাহাদের কেহ বা বলিয়াছিল ঠিক আর কেহ বা অঠিক। সত্য বহুমুখী এ তত্ত্বটা আমার খুব ভাল লাগে। এই তত্ত্ব অনুসারে মুসলমানকে মুসলমানের ও খ্রীষ্টানকে খ্রীষ্টানের দৃষ্টিতে আমি দেখিতে শিখিয়াছি। এক সময়ে অন্যের অজ্ঞতা দেখিয়া আমার রাগ হইত। তাহাদের এখন আমি ভালবাসিতে পারি কারণ অন্যে আমাকে আর আমি অন্যকে কোন্ চক্ষে দেখি তাহা বোঝার দৃষ্টি আমার খুলিয়াছে। সারা হুনিয়াকে আমি ভালবাসার আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিতে চাই। সত্য ও অহিংসার দ্বৈত তত্ত্ব হইতে আমার অনেকান্তবাদ সমুত্থিত।

তাঁকে আমি যেমন দেখি তেমন বলি। আমার দৃষ্টিতে তিনি স্রষ্টা, আবার নহেনও। উপরে বলিয়াছি, সত্যের বিবিধরূপে আমি বিশ্বাসী। ওই বিশ্বাসেরই ইহা ফল। জৈন বিচার মতে ভগবানকে আমি অস্রষ্টা রূপে দেখি আর রামানুজের পদাঙ্কানুসরণে স্রষ্টা রূপে। বস্তুত আমরা সকলে অচিন্ত্যেরই চিন্তা করি, বর্ণনাতীতেরই বর্ণনা করি, অজ্ঞেয়কে জানার চেষ্টা করি। আর তাই বাণী থতমত খায়, যাহা বলিতে চায় বলিয়া উঠিতে পারে না, কথা জুয়ায় না, আর অনেক সময় উল্টাটি বলিয়া বসে। তাই ব্রহ্মার বর্ণনা বেদ 'নেতি'

'নেতি' শব্দে করিয়াছে। তিনি বা ইহা নেতি হইতে পারেন, কিন্তু তাঁর বা ইহার অস্তিত্ব আছে। আমি আছি, আমাদের মা-বাপ, ঠাকুরমা-ঠাকুরদা ছিল এ কথা যদি মানি তো বিশ্বেরও জনক আছে এই বিশ্বাসের হেতু আছে। তিনি নাই তো আমাদের পাত্তাই নাই, আর তাই তো আমরা সবে একই ভগবানকে নানা নামে—পরমাত্মা, ঈশ্বর, শিব, রাম, আল্লা, খোদা, দাদা, অহুর মজ্‌দ, যহ্‌ব, গড্‌ ইত্যাদি অনন্ত নামে ডাকি। তিনি এক, আবার বহুও বটেন ; অণু অপেক্ষা ক্ষুদ্র আবার হিমালয় অপেক্ষা বিরাট্‌। সমুদ্রের বিন্দুতেও তিনি, আবার সাত সমুদ্রের বিস্তারেও তাঁর ঠাঁই হয় না। বুদ্ধি তাঁকে ধরিতে অক্ষম। তর্কের তিনি অতীত, যুক্তির উর্ধ্বে। এত কথাই বা বলিতে যাই কেন ? বিশ্বাসই এখানে আসল কথা। যুক্তি সহায়ে তর্কের অগণিত অবলম্ব দাঁড় ও খণ্ডন করিতে পারি। নাস্তিক আমাকে তর্কে পরাজিত করিতে পারে। কিন্তু আমার বিচার এক পা যায় তো আমার বিশ্বাস শত পা ধায়, তাই হুংকার দিয়া সারা জগতকে বলিতে পারি, 'ভগবান আছেন ছিলেন আর অনন্তকাল থাকবেন।'

যে কেহ তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারে, কোন বাধা নাই। ভগবান দয়াময়, কৃপাসিন্ধু। পৃথিবীর রাজা-রাজড়ার মত স্বীয় প্রভুত্ব স্বীকার করানোর জন্য সৈন্য-সামন্তের তাঁর দরকার নাই। স্বাতন্ত্র্য তিনি আমাদের দেন আবার কৃপাবশ হইয়া তাঁর অভিপ্রায়ের কাছে আমাদের মস্তক নত না করাইয়া ছাড়েন না। আমাদের কেহ যদি তাঁর ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করিতে অবজ্ঞা বোধ করে তো তিনি বলেন, 'ভাল, করো না। আমার সূর্য তোমায় সমান আলো দেবে, আমার মেঘ তোমায় সমানই জল দেবে। আমার প্রভুত্ব জোর করে তোমার ওপর চাপাতে যাবো না।' এমন যে ভগবান তাঁর অস্তিত্বে মূর্খেরা অবিশ্বাস করে করুক। কোটি কোটি বোদ্ধা লোক তাঁর

অস্তিত্বে আস্থাবান ; আমি তাহাদের একজন। তাঁর কাছে নতি স্বীকার করিতে, তাঁর মহিমা কীর্তন করিতে আমার ক্লান্তি নাই।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২১-১-২৬]

৪

সত্যই ভগবান

[গোলটেবিল বৈঠক হইতে ফিরিবার পথে সুইজারল্যাণ্ডের এক সভায় প্রশ্নোত্তরে গান্ধীজী বলেন :]

ভগবানকে আমি সত্যস্বরূপ মনে করি কেন এ কথা আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। বিষ্ণুসহস্রনাম আবৃত্তি করার শিক্ষা কিশোর বয়সে লাভ করিয়াছিলাম কিন্তু এই সহস্র নামেই ভগবানের নামের শেষ নয়। যত জীব তত শিব (ভগবানের তত নাম) এ কথায় আমরা বিশ্বাস করি—আর আমার মতে এ কথা ঠিকও বটে। আর তাই তো আমরা বলি যে ভগবান ননামা ; তাঁর অনেক রূপ, তাই তাঁকে আমরা নিরাকার বলি ; বহু কণ্ঠে কথা বলেন তাই তাঁকে অবাক্ বলি—এমনি আরও কত কি। আর ইস্‌লামের কথাই ধরুন। ইস্‌লাম সম্বন্ধে পড়াশোনার পরে দেখিলাম ইস্‌লামেও ভগবানের অনেক নাম। যাহারা ভগবানকে প্রেমস্বরূপ মনে করে তাহাদের সুরে সুর মিলাইয়া বলিতাম ভগবান প্রেমস্বরূপ। কিন্তু অন্তরের গভীরে আমি বলিতাম প্রেমস্বরূপ হইলেও ভগবান সর্বোপরি সত্য-স্বরূপ। ভগবানের নিখুঁত বর্ণনা মানুষের জিহ্বা আদৌ করিতে সক্ষম এ কথা ধরিয়া লইয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে,

আমার কাছে ভগবান সত্যস্বরূপ। কিন্তু দুই বছর আগে আমার সিদ্ধান্ত আরও আগাইয়া যায় আর আমি বলি যে সত্যই ভগবান। 'ভগবানই সত্য' আর 'সত্যই ভগবান' আমার এই দুই উক্তির মধ্যে যে সূক্ষ্ম ব্যবধান আছে তাহা লক্ষ্য করিবেন। আর এই সিদ্ধান্তে আমি পৌঁছিয়াছি পঞ্চাশ বৎসরব্যাপী সত্যের নিরন্তর কঠোর সাধনার ফলস্বরূপ। তখন আমি বুঝিতে পারি যে প্রেমের পথই সত্যোপলব্ধির সহজতম পথ। কিন্তু ইহাও আমি দেখিতে পাই যে প্রেম শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়, ইংরাজী ভাষায় তো বটেই। আরও দেখিতে পাই যে কাম অর্থে মানব-প্রেম অধঃপাতেরও সোপান হইতে পারে। ইহাও বুঝিতে পারি যে অহিংসা অর্থে প্রেমের পূজারী পৃথিবীতে বড় বেশী নাই। কিন্তু সত্যের একাধিক অর্থ আমি কখনও দেখি নাই। তা ছাড়া নাস্তিকেরা পর্যন্ত সত্যের প্রয়োজনীয়তার বা শক্তির কথা অস্বীকার করেন না। বরং সত্যানুসন্ধানের আগ্রহাতিশয্যে ভগবানের অস্তিত্বই তাঁহারা উড়াইয়া দিয়াছেন,—তাঁহাদের দৃষ্টি হইতে অবশ্য তাঁহারা ঠিকই করিয়াছেন। আর ইহা হইতে আমি বুঝিতে পাই যে ভগবানই সত্য না বলিয়া সত্যই ভগবান বলা সঙ্গত হইবে। চার্লস্ ব্রাডল-র কথা মনে পড়ে। নাস্তিক বলিয়া নিজের পরিচয় দিতে তিনি ভালবাসিতেন। কিন্তু তাঁহার কথা কিছুটা আমি জানি। তাঁহাকে কিছুতেই আমি নাস্তিক বলিব না। তাঁহাকে আমি ভগবান-ভীরু লোক বলিব; আমি জানি আমার এই কথা তিনি স্বীকার করিবেন না। 'আপনি সত্য-ভীরু সুতরাং ঈশ্বর-ভীরু লোক' এ কথা যদি শ্রীযুক্ত ব্রাডলকে বলি তো তাঁহার মুখ রক্তাভ হইবে। 'সত্যই ভগবান' এ কথা বলিয়া তাঁহার সমালোচনার মুখ সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করিয়া দিব। এই কথা বলিয়া অনেক যুবকের সমালোচনা আমি শান্ত করিয়াছি। তা ছাড়া একটা মস্ত অসুবিধাও আছে, কেননা কোটি কোটি লোক ভগবানের নাম লইয়াছে এবং তাঁরই নামে অসংখ্য

পাপকর্ম করিয়াছে। বিজ্ঞানবিদেরা সত্যের নামে যে প্রায়ই নিষ্ঠুর কার্য করে সে কথা আমি ভুলিয়া যাইতেছি না। আমি জানি যে লোকে সত্য ও অহিংসার নামে জ্যান্ত প্রাণীদেহ ব্যবচ্ছেদ করার মত অমানুষিক নিষ্ঠুর কার্য করে। তাই ভগবানের বর্ণনা যিনি যে ভাবেই করুন না কেন কতকগুলি অসুবিধার সম্মুখীন না হইয়া উপায় নাই। মানুষের মন এক সসীম বস্তু। মানুষের শক্তির অগম্য কোন সত্তা বা বস্তুর ধারণা করিতে গেলেই আমাদিগকে সীমাবদ্ধ পরিধির মধ্যে পথ হাতড়াইতে হয়।

তা ছাড়া হিন্দু দর্শনে আর একটা জিনিসও আছে। উহা বলে—এক ভগবানই আছেন ; আর কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই। আর দেখা যাইবে যে, ইসলামের কল্‌মায় ঠিক এ কথার উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে, এই ভাবই বিশদ করা হইয়াছে। কল্‌মায় স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে এক ভগবানই আছেন আর কিছু নাই। বস্তুত ট্রুথ (Truth)-এর সংস্কৃত প্রতিশব্দ সৎ-এর মানেই—যাহা আছে। এই কারণেই—অন্য নানা কারণও দেখানো যাইতে পারে—সত্যই ভগবান এই সংজ্ঞা আমার কাছে সর্বাপেক্ষা ভাল লাগে। আর তাই না এই সিদ্ধান্ত। তা ছাড়া সত্যকে ভগবানরূপে পাওয়ার একটি মাত্রই পথ—প্রেম তথা অহিংসা ; অন্য পথ নাই। আর যাহা উপায়, অন্তে তাহাই উদ্দেশ্য—এ কথা বিশ্বাস করি বলিয়া বিনা দ্বিধায় বলি যে ভগবানই প্রেম।

সত্যের স্বরূপ তবে কি ?

প্রশ্নটি কঠিন। তবে অন্তরপুরুষ যাহা বলে তাহাই সত্য এই বলিয়া আমার মত আমি সমাধান করিয়া লইয়াছি। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হইবে, ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন আর বিরোধী সত্যের কথা যে বলে ? ভাল, এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, মানবমনের প্রকাশ হয় অগণিত মাধ্যমের ভিতর দিয়া আর সকল মানুষের বিকাশের স্তরও

সমান নয়। অতএব ইহা সুস্পষ্ট যে, একজনের কাছে যা সত্য অপর একজনের কাছে তাহা অসত্য হইতে পারে। তাই তো যাঁহারা এই সব বিষয়ে পরীক্ষা-প্রয়োগ করিয়াছেন তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে এইসব পরীক্ষার জন্য কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিতে হইলে উহার আগে যেমন বিজ্ঞানের ক্রমিক অধ্যয়ন না করিলে নয়, আধ্যাত্মিক গবেষণা করিতে হইলেও আগে তেমন কতকগুলি যম ও নিয়ম নিষ্ঠাসহকারে পালন করিতে হয়। অতএব বিবেকের দোহাই দেওয়ার আগে প্রত্যেকের তলাইয়া দেখা উচিত ওইরূপ বলার অধিকার তাহার আছে কিনা। তাই অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে নিজ জীবনে যাঁহারা সত্যকে ভগবানরূপে পাইতে চাহেন তাঁহাদের সত্য, ব্রহ্মচর্য (পবিত্রতা—কারণ সত্য ও ভগবানের প্রতি টানের ভাগ-বখ্‌রা অন্য কোন কিছুর সঙ্গে করা চলে না), অহিংসা, অস্তেয় ও অপরিগ্রহ এই পঞ্চ মহাব্রত পালন করিতে হয়। এই পঞ্চ মহাব্রত পালন না করিলে আধ্যাত্মিক গবেষণার অধিকার জন্মে না। কতকগুলি বিধি-নিষেধও আছে কিন্তু সে সবের উল্লেখ এখানে নাই করিলাম। এ কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যাহারা এই দিকে পরীক্ষা করিয়াছে তাহারা জানে যে সকলের পক্ষে বিবেকবাণী শোনার দাবি করা সাজে না। অথচ সংযমের ধারও জীবনে ধারে না এমন যে কেহ আজ বিবেকের দোহাই দিতেছে। আর তাহার ফলে অসত্যের বহুল প্রচারে দুনিয়ার লোক বিভ্রান্ত হইতেছে। এমতাবস্থায় সবিনয়ে এই কথাই কেবল বলিব যে, অশেষ নম্রতা বিনা সত্যের দর্শন মিলিবার নয়। সত্যরূপ অনন্ত আকাশে বিচরণ করিতে চান তো আপনাকে শূন্য বনিতে হইবে। এই দিব্য পথের বিষয়ে ইহার অধিক আর কি বলিতে পারি।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩১-১২-৩১]

৫
ভগবানই প্রেম

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, অণুরাশিকে পরস্পর সংহত রাখার মত এক ধারকশক্তি আছে। যদি না থাকিত তবে অণুতে গঠিত আমাদের এই জগৎ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। জড় পদার্থের এই ধারকশক্তির মত চেতন জগতকেও এক শক্তি ধারণ করিয়া আছে। প্রেম চেতন জগতের সেই ধারকশক্তি। বাপ-বেটা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব এই বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু এই শক্তি সহায়ে কেমন করিয়া তাবৎ প্রাণিজগতকে বাঁধিতে হয় তাহা আমাদের শিখিতে হইবে আর সে শিক্ষাই হইবে ভগবান-উপলব্ধির সোপান। জীবনের বিকাশ প্রেমে ; জীবনের বিনাশ দ্রোহে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৫-৫-২০]

স্বভাবে বিকর্ষণের অভাব নাই। তাহা হইলেও আকর্ষণের আলিঙ্গনে তাহা টিকিয়া আছে। পরস্পরের প্রতি টান আছে তাই প্রকৃতি আছে। নাশ করিলে উহার চলে না। আত্মপ্রীতি মানুষকে পরপ্রীতি শিখায়। দেশ যে দেশের সঙ্গে মানাইয়া চলে তার কারণ দেশের অধিবাসীরা পরস্পরের সঙ্গে মানাইয়া চলে। একদিন দেশ-ধর্ম বিশ্ব-ধর্মে পরিণত হইবে, যেমন গৃহ-ধর্ম রূপান্তরিত হইয়াছে দেশ-ধর্মে—বৃহত্তর পরিবারে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২-৩-২২]

ধ্বংসের মধ্যেও জীবনের খেলা আমি দেখিয়াছি আর তাই বলি, ধ্বংস অপেক্ষা উচ্চতর এক ধর্ম আছে। তেমন নিয়মাধীনেই কেবল

সুনিয়ন্ত্রিত সমাজের কথা ভাবা যায়, মানুষের মত জীবন যাপন করা যায়। তাহাই যদি জীবনধর্ম হয় তো সে জীবনধর্ম দৈনন্দিন জীবনে আমাদের আচরণ করা চাই। যদি মন-কষাকষি দেখা দেয়, যদি প্রতিপক্ষ দ্বন্দ্বে আহ্বান করে তো ভালবাসা দিয়া তাহাকে জয় কর। এমন সহজ সরল ভাবেই নিজ জীবনে এই ধর্ম আমি আচরণ করিতে সযত্ন প্রয়াস করিয়াছি। তার মানে এই নয় যে আমার সকল সমস্যা দূর হইয়াছে। তবে এই কথা ঠিক যে, প্রেমধর্ম হইতে যে কাজ পাইয়াছি উচ্ছেদ-ধর্ম হইতে তাহা কখনও পাই নাই।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১-১০-৩১]

আমার বিশ্বাস মানুষের ক্রিয়ার মোট পরিণাম এই : আমাদের অবনতি হইতেছে না, হইতেছে উন্নতি আর এই অগ্রগতি যে প্রেমধর্মের অলক্ষ্য ক্রিয়ার ফল তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। মানুষের জীবন-প্রবাহ থামিয়া যায় নাই। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, মারকশক্তি অপেক্ষা ধারকশক্তি, দূরে সরিয়া যাওয়ার বৃত্তি অপেক্ষা নিকটে আসার বৃত্তি অধিক বলবান।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১২-১১-৩১]

প্রেম তথা অহিংসাকে যদি আমরা জীবনধর্ম বলিয়া না মানি তবে যুদ্ধ হইতে অব্যাহতি নাই ; কিছু দিন পরে পরে তাহা ঘটিতেই থাকিবে আর উত্তরোত্তর অধিক ভয়াবহ হইবে।

[হরিজন, ২৬-৯-৩৬]

তত্ত্বদর্শীরা সকলেই অল্পাধিক আগ্রহভরে এই ধর্ম যুগে যুগে লোকসমাজের কাছে ধরিয়াছেন। প্রেম যদি জীবনধর্ম না হইত তবে মৃত্যুর ক্রোড়ে জীবনের খেলা চলিত না। বিনাশকে বিকাশ করে চির-

পরিহাস। মানুষে ও পশুতে বস্তুত যদি কোন মৌলিক ব্যবধান থাকে তো তাহা এইখানে—মানুষ এই ধর্ম উত্তরোত্তর অধিক মানিয়া লইয়াছে এবং নিজ জীবনে তাহা আচরণ করিয়াছে। পৃথিবীর সাধুপুরুষমাত্রই, কি সেকালের কি একালের, নিজ নিজ উপলব্ধি ও জ্ঞানগরিমা অনুসারে এই ধর্মের মূর্তিমান দৃষ্টান্ত। সত্য বটে যে পশুবৃত্তির টানে মানুষকে প্রায়ই অতি সহজে ভাসিয়া যাইতে দেখা যায়। এই ধর্ম তাহাতে খণ্ডিত হয় না; আচরণ করা কঠিন এ কথাই মাত্র সপ্রমাণ হয়। সত্যের ন্যায় মহৎ ও উচ্চ যে ধর্ম তাহা এমনটা হইবে না তো কি! বিশ্বের সকল অধিবাসী যখন এই ধর্ম পালন করিবে তখন স্বর্গের ন্যায় পৃথিবীতেও ভগবানের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। স্বর্গ-মর্ত্য মনের বাইরে নয় এ কথা আমি জানি, স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না। পৃথিবীর পরিচয় আমাদের আছে; অন্তরের স্বর্গের পরিচয় আমাদের নাই। কেহ কেহ এই ধর্ম আচরণ করিতে সমর্থ এ কথা মানি তো এ কথাও মানিতে হয় যে অন্য সকলের পক্ষে তাহা সম্ভবপর। নতুবা যাহা নয় তাহাই ধরিয়া লওয়া হইবে। নেহাত আদিম যুগের কথা নয়, আমাদের পূর্বজরা নর-খাদক ছিল, এবং আজ আমাদের কাছে জঘন্য ঠেকে এমন আরও কত কি তাহারা করিত। মানুষের মাংস মানুষের খাইতে নাই এমন অদ্ভুত প্রচার করার জন্য ডিক্ শেপার্ডের ন্যায় লোক সে যুগেও নিশ্চিত ছিল আর তাঁহারই মত তাহারা উপহসিত অথবা লাঞ্ছিত হইত।

[হরিজন, ২৬-৯-৩৬]

ভগবান শূন্যে বিরাজমান কল্পিত শক্তি নয়। ভগবান আমাদের অন্তরে বিরাজমান এক অব্যক্ত শক্তি; হাতের নখ মাংসের যত কাছে, তাহা অপেক্ষাও তিনি আমাদের অধিক কাছে। আরও অনেক শক্তি আমাদের মধ্যে লুকাইয়া আছে; নিরন্তর কঠোর তপস্যা করিলে

তাহাদের খোঁজ মিলে। তদ্রূপ তাঁর দর্শন লাভ না হওয়া পর্যন্ত নিরস্ত হইব না এই সংকল্পপূর্বক তীব্র সাধনা করিলে এই পরাশক্তিরও দর্শন মিলে। তাঁকে পাওয়ার নানা পথের এক পথ অহিংসা। ভগবান সর্বভূতে বিরাজমান আর তাই তাহাদের কাহাকেও বাদ না দিয়া সকলের সহিত সমত্ব উপলব্ধি করা একান্ত আবশ্যক। একেই বিজ্ঞানের ভাষায় বলে টান বা আকর্ষণ। লৌকিক ভাষায় ইহার নাম প্রেম। ইহা আমাদের একে অন্যের সহিত ও ভগবানের সহিত যুক্ত করে। প্রেম ও অহিংসা একই বস্তু।

(কোন ব্যক্তিকে ১-৬-৪২ সনে লিখিত পত্র হইতে)

[হরিজন, ২৮-৩-৫৩]

৬

ব্রহ্ম—সচ্চিদানন্দ

সৎ হইতে সত্য শব্দ আসিয়াছে ; সৎ মানে 'থাকা'। বস্তুত সত্য ছাড়া কিছু নাই, কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই। অতএব বলা চলে যে সৎ তথা সত্যই ভগবানের মহত্তম সংজ্ঞা। ভগবানই সত্য না বলিয়া বস্তুত সত্যই ভগবান বলা সমধিক সঙ্গত। কিন্তু শাসক বা সেনাপতি না হইলে মানুষের চলে না বলিয়া ভগবানকে সাধারণত লোকে 'রাজাধিরাজ' বা 'সর্বশক্তিমান' বলে আর ভবিষ্যতেও বলিবে। কিন্তু তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে সৎ বা সত্যই ভগবানের একমাত্র সঙ্গত ও পূর্ণ অর্থবাচক সংজ্ঞা।

সত্য যেখানে জ্ঞানও সেখানে। জ্ঞান সত্যস্বরূপ। সত্য যেখানে নাই যথার্থ জ্ঞান সেখানে থাকিতে পারে না। তাই তো ভগবানের নামের সহিত চিৎ বা জ্ঞান শব্দ জোড়া হয়। আর যেখানে প্রকৃত

জ্ঞান সেখানেই চির-আনন্দ। দুঃখের তথায় ঠাঁই নাই। আর সত্য যেমন নিত্য, সত্যসম্ভূত আনন্দও তেমন নিত্য। তাই ভগবানকে আমরা সচ্চিদানন্দ বলি; সত্য, জ্ঞান ও আনন্দধাম বলিয়া জানি।

এই সত্যের একান্ত সাধনা করি তো জীবন সার্থক, নয় তো তাহা ব্যর্থ। যে কোন কর্ম করি সবই সত্যোপলব্ধির জন্য করা চাই। সত্য প্রাণ-প্রতিম হওয়া চাই। আধ্যাত্মিক সাধনার এই স্তরে যখন লোকে পৌঁছে তখন যম-নিয়মাদি কৃত্য সহজসাধ্য হয়, জীবনের সহজ ক্রিয়া হইয়া যায়। সত্য বিনা নীতিই বল, ব্রতই বল কোন কিছুই সম্ভব নয়।

সত্যের সাধনা বলিতে লোকে সাধারণত কেবল সত্য কথা বলাই বোঝে। কিন্তু আশ্রমবাসী আমাদের কাছে সত্যের অর্থ অনেক বেশী ব্যাপক। কায়মনোবাক্যে সত্যের সাধনা করা চাই। সত্যের সম্যক্ দর্শন যাহার হইয়াছে পৃথিবীতে তাহার কিছু জানার বাকী নাই, কেননা স্বভাবধর্মেই সত্য সকল জ্ঞানের আকর। ইহার বাইরে যাহা তাহা সত্য নয়, অতএব প্রকৃতজ্ঞানও নয়। আর জ্ঞান নাই তো আন্তরিক শান্তিও নাই। সত্যের অব্যর্থ তৌল-দণ্ডে তৌল করিতে শিখিয়াছি তো কি যে করিতে হইবে দেখিতে হইবে পড়িতে হইবে তাহা দিবালোকের মত স্পষ্ট হইবে।

কিন্তু পরশপাথরের বা কামধেনুর মত এই-যে সত্য, তাহা উপলব্ধি করার উপায়? গীতা বলে একাগ্র অভ্যাস ও নিঃসঙ্গ বৈরাগ্যের দ্বারা তাহা সম্ভব। এরূপ নিষ্ঠা সত্ত্বেও একের কাছে যাহা সত্য অন্যের কাছে কখন কখন তাহা অসত্য মনে হইবে। কিন্তু সাধকের তাহাতে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নাই। প্রযত্ন যদি ঐকান্তিক হয় তবে দেখা যাইবে যে, বিভিন্ন মনে হইলেও সত্য অভিন্ন, যেমন দেখিতে ভিন্ন মনে হইলেও একই বৃক্ষের অসংখ্য পাতা অভিন্ন। ভগবান স্বয়ং নানা লোকের কাছে নানা রূপে দেখা দেন না কি?

তাহা হইলেও আমরা জানি যে তিনি এক। তবুও সত্যই ভগবানের যথার্থ সংজ্ঞা। অতএব ভিন্ন ভিন্ন লোকে নিজ নিজ উপলব্ধি অনুসারে যদি সত্যের সাধনা করে তো কোন দোষ নাই। বস্তুত হওয়া তো চাই তাহাই। সে স্থলে সত্যের সাধনায় কাহারও যদি কোথাও গল্‌তি হয় তো আপনা হইতেই তাহা শোধরাইয়া যাইবে। কারণ তপ ছাড়া সত্যের সাধনা হয় না আর সেই তপের শেষ মৃত্যুতেও হইতে পারে। আত্ম-স্বার্থের আদৌ ঠাঁই নাই। এরূপ স্বার্থলেশশূন্য সত্যের সাধনায় মানুষ দীর্ঘদিন ভুল পথে চলিতে পারে না। অন্যায় করে তো হোঁচট খাইয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে ঠিক পথে ফিরিতে হয়। অতএব সত্যানুসন্ধানই যথার্থ ভক্তি। ভগবানকে পাওয়ার তাহাই পথ। ভীরুতার স্থান ইহাতে নাই। পরাজয়ও নাই। এই দিব্য পথ মানুষকে মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্র প্রহ্লাদ রামচন্দ্র ইমাম হাসান ইমাম হোসেন ও খ্রীষ্টীয় সন্তদের জীবন ও দৃষ্টান্ত স্মরণ করিলে আমাদের লাভ হইবে। এই দেহ যতদিন পাত না হয়, সত্যে লীন না হয়, ততদিন নরনারী আমরা সবে যদি সকল কর্মে, আহারে-বিহারে, খেলাধূলায় সত্যের একাগ্র সাধনা করি তো কতই না ভাল হয়! সত্যরূপী ভগবান আমার অমূল্য নিধি, অন্য সকলেরও তিনি অমূল্য নিধি হউন।

[যারবেদা মন্দির হইতে, প্রথম অধ্যায়]

৭

সত্য ও স্বভাব

ঈশ্বরের সকল বিধির কথা আমরা জানি না, উহাদের ক্রিয়ার স্বরূপ যে কি তাহাও জানি না। অতি বড় বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক সাধকের জ্ঞানও ধূলিকণাসম। ভগবান আমার কাছে মর্ত্যলোকের দেহধারী পিতার তুল্য নহেন, তিনি অনন্ত ঐশ্বর্যশালী। আমার তুচ্ছাতিতুচ্ছ ক্রিয়া পর্যন্ত তাঁর ইঙ্গিতে নিয়ন্ত্রিত। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাতাটি পর্যন্ত নড়ে না এ কথা আমি অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করি। আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্তা তিনি।

[হরিজন, ১৬-২-৩৪]

তিনি ও তাঁর বিধি অভিন্ন। বিধিই ভগবান। তাঁতে যাহা আরোপ করা হয় তাহা ঐশ্বর্যমাত্র নয়। স্বয়ং তিনিই ঐশ্বর্য। সত্য তিনি, প্রেম তিনি, বিধি তিনি, আর যাহা কিছু কল্পনা করা যায় তাহাও তিনি।

[হরিজন, ১৬-২-৩৪]

স্বভাবের নিয়ম বদলায় না, বদলানো যায় না আর অলৌকিক কিছুও তাহাতে ঘটে না। তার অর্থ তাহা ব্যতিক্রমরহিত, লঙ্ঘন তাহার হয় না। কিন্তু বদ্ধ জীব আমরা নানা কথা ভাবি আর আমাদের নিজ অক্ষমতা ভগবানে আরোপ করি। ভগবানের আমরা অনুকরণ করি, তিনি আমাদের করেন না। ত্রিকালের সীমায় তাঁকে সীমিত করা আমাদের সাজে না। তিনি অ-কাল। অতীত,

বর্তমান, ভবিষ্যৎ—সে তো আমাদের জন্য। মানুষের শতায়ু অনন্ত কালের তুলনায় এক পল বইকি।

[হরিজন, ১৭-৪-৩৭]

স্বরচিত বিধির রদবদল বা সংশোধন করার অধিকার ভগবান নিজে রাখেন নাই, সে দরকারও নাই। তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ তাঁর নখদর্পণে। তাই পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংশোধন বা পরিবর্ধন করার দরকার তাঁর নাই।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৫-১১-২৬]

আমাদের পার্থিব জীবন মেয়েদের হাতের বেলোয়ারী চুড়ির মত ক্ষণভঙ্গুর। সিন্দুকে যদি রাখেন, নাড়াচাড়া যদি না করেন তো বেলোয়ারী চুড়ি হাজারো বছর থাকিবে। কিন্তু পার্থিব জীবন এমনই ক্ষণস্থায়ী যে নিমেষে তাহা শেষ হইতে পারে। তাই আসুন সময় থাকিতে উচ্চ-নীচ ভেদভাব ভুলিয়া যাই, হৃদয় শুদ্ধ করি .আর দেহান্তে (ভূমিকম্পেই ঘটুক বা অন্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বা গতানুগতিকভাবে) স্রষ্টার সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত হই।

[হরিজন, ২-২-৩৪]

পৃথিবীর সভ্য-অসভ্য সকল লোকের মত আমিও বিশ্বাস করি যে, আমাদের উপর যে বিপদ* আসে তাহা আসে আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপে। এই বিশ্বাস অন্তরের বিশ্বাস হয় তো লোকে প্রার্থনা করে, অনুতাপ করে, নিজেদের মলিনতা ধুইয়া ফেলে···তাঁর অভিপ্রায়ের জ্ঞান আমার আর কতটুকু! এরূপ বিপর্যয় ঈশ্বরের বা প্রকৃতির খেয়ালে ঘটে না। গ্রহসমূহ যেমন নির্দিষ্ট নিয়মবশে চলে এসব আপদও তেমন নির্দিষ্ট নিয়মবশে ঘটে। যে সকল নিয়মবশে

* ১৯৩৪ সনের বিহার ভূমিকম্প প্রসঙ্গে

এরূপ ঘটনা ঘটে সে সব জানি না বলিয়া এসবকে আমরা বিপদ বা বিপর্যয় বলি।

[হরিজন, ২-২-৩৪]

ভৌতিক আপদ-বিপদের মূলে ঈশ্বরের অভিপ্রায় বিদ্যমান। খুব সম্ভব পরম-উৎকর্ষপ্রাপ্ত বিজ্ঞান কখন ভূকম্প হইবে তাহা আগেই বলিয়া দিবে যেমন আজ তাহা বলিয়া দেয় গ্রহণ কখন লাগিবে। তাহা মানববুদ্ধির আর এক অভিনব বিজয় হইবে। কিন্তু এরূপ অনন্ত বিজয়েও চিত্তশুদ্ধি হইবে না। আত্মশুদ্ধি অভাবে সব কিছু ব্যর্থ।

[হরিজন, ৮-৬-৩৫]

যাহারা আত্মশুদ্ধির কথা মানে তাহাদের আমি এই সকলের মূলে যে ঈশ্বরের অভিপ্রায় নিহিত সে কথা বুঝিতে, এই সব হইতে নম্রতা শিখিতে, অন্তিম দিবসে স্রষ্টার কাছে জবাবদিহি করার জন্য প্রস্তুত হইতে ও দুর্গত ভাই-বোনদের—যে কেহ হোক না—দুঃখে দুঃখী হইতে বলি।

[হরিজন, ৮-৬-৩৫]

ভগবান জগতে অমঙ্গল ঘটিতে দেন এ কথা শুনিতে ভাল লাগে না। কিন্তু মঙ্গল যদি তাঁর ক্রিয়া হয় তবে অমঙ্গলও তাঁর ক্রিয়া। ভগবান রাবণকে অতুলনীয় শক্তি প্রদর্শন করিতে দেন নাই কি? ভগবান যে কি তাহার সঠিক ধারণা নাই বলিয়া যত গোল বাধে। ভগবান দেহধারী নহেন। বর্ণনার তিনি অতীত। বিধির প্রণেতাও তিনি, বিধিও তিনি, আর বিধায়কও তিনি। এই ক্ষমতা দাবি করা কোন লোকের সাজে না। করে তো লোকে তাহাকে মহা

স্বেচ্ছাচারী বলিবে। ভগবান বলিয়া যাঁর পূজা আমরা করি একমাত্র তাঁরই এ দাবি করা সাজে।

[হরিজন, ২৪-২-৪৬]

ঠিক ঠিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখেন তো ভাল মন্দ এই দুইয়েরই মূল কারণ ভগবান। আততায়ীর হাতের ছোরাও তিনি, আবার ডাক্তারের হাতের ছুরিও তিনি। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মানুষের ব্যাপারে ভাল ও মন্দ একে অন্য হইতে আলাদা, একে অন্যের বিপরীত,—আলো-আঁধারের, ভগবান-শয়তানের তাহা প্রতীক।

[হরিজন, ২০-২-৩৭]

আমার দৃষ্টিতে ভগবান দেহধারী নহেন। সত্যই আমার কাছে ভগবান। পৃথিবীর রাজা ও তাঁহার বিধান যেমন পৃথক, ভগবানের বিধান ও ভগবান তেমন পৃথক পৃথক বস্তু বা ঘটনা নয়। কারণ ভগবানই উপমান, বিধি স্বয়ং। অতএব এ কথা ভাবাই যায় না যে তিনি বিধি লজ্ঘন করেন। অতএব তিনি আমাদের কর্ম নিয়ন্ত্রণ করেন না। তিনি আলগোছ থাকেন। তিনি আমাদের কর্ম নিয়ন্ত্রণ করেন এ কথা বলি তো সেরেফ মানুষের ভাষায় কথা বলি আর তাঁকে সীমায় সীমিত করার চেষ্টা করি। উল্টা, তিনি ও তাঁর বিধি সর্বব্যাপী ও সর্বনিয়ামক। তাই আমি মনে করি না যে তিনি আমাদের যে-কোন খুঁটিনাটি অনুরোধে সাড়া দেন, তবে এ বিষয়েও সংশয় নাই যে তিনি আমাদের কর্ম নিয়ন্ত্রণ করেন। আর আমি অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করি যে, তাঁর ইচ্ছা বিনা তৃণটি পর্যন্ত গজায় না, দোলে না। আমাদের ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্য জনাকীর্ণ জাহাজের যাত্রীদের ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্য অপেক্ষাও কম।

“ভগবানে যখন আপনি চিত্তসংযোগ করেন তখন আপনি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন কি ?”

করি। যাত্রী-ভর্তি জাহাজে লোকে যেমন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে তেমন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না। যাত্রীর স্বাধীনতা অপেক্ষাও আমার স্বাধীনতা কম এ কথা আমি জানি। তবুও তাতেই আমি তুষ্ট। তার কারণ, মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য-নিয়ন্তা অর্থাৎ নিজ স্বাধীনতার যে কোনরূপ ব্যবহার করার অধিকার তাহার আছে, গীতার এই মূল শিক্ষা আমার জীবনের পরতে পরতে গাঁথিয়া গিয়াছে। কিন্তু ফলে তাহার হাত নাই। হাত আছে মনে করিয়াছে তো সে গিয়াছে!

[হরিজন, ২৩-৩-৪০]

৮

ভগবান দরিদ্রনারায়ণরূপে

ভগবান সংজ্ঞাতীত, মানব-বুদ্ধির অজ্ঞেয়। তবুও অনন্ত নামে লোকে তাঁকে ডাকে। দরিদ্রনারায়ণ সেই অনন্ত অভিধার এক অভিধা। তার মানে দরিদ্রের ভগবান, দরিদ্রের হৃদয়নিবাসী ভগবান।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৪-৪-২৯]

অন্নই দরিদ্রের কাছে পরমার্থ। ক্ষুৎপীড়িত অগণিত জনতার কাছে অন্য কোন কিছুর ঠাঁই নাই। তাহাতে সে কান দিবে না। আপনি অন্নের সংস্থান করিয়া দিলে আপনাকে তাহারা ভগবান জ্ঞান করিবে। অন্য কোন চিন্তা তাহাদের নাই।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৫-৫-২৭]

এই হাতেই শত-ছেঁড়া কাপড়ের আঁচলে সযত্নে বাঁধা জংধরা পোয়া-পয়সা আমি তাহাদের কাছ হইতে লইয়াছি। তাদের কাছে

আধুনিক প্রগতির কথা বলিবেন! তাহাদের কাছে ভগবানের কথা বলিবেন! তাহা হইবে নির্মম পরিহাস। তাহাদের কাছে ভগবানের কথা বলিতে গেলে আপনাকে ও আমাকে তাহারা দানব মনে করিবে। ভগবানকে তাহারা যদি জানে তো জানে মহাভীতির প্রতিহিংসার ক্রূর অত্যাচারীর প্রতিমূর্তিস্বরূপে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৫-৯-২৭]

তাহাদের কাছে ভগবানের কথা বলার সাহস আমার নাই। ওই সব নিষ্প্রভ-দৃষ্টি, ক্ষুধার্ত অগণিত জনতার কাছে ভগবানের কথা বলা আর ওই কুকুরের কাছে ভগবানের কথা বলা একই কথা। অন্নই তাহাদের কাছে একমাত্র ভগবান। তাহাদের কাছে ভগবানের বাণী কেবলমাত্র পবিত্র কর্মরূপেই ধরা যাইতে পারে। উত্তম প্রাতরাশের পরে এবং মধ্যাহ্নে আরও উত্তম আহার মিলিবে এই কথা জানিয়া ভগবানের কথা খুবই বলা চলে কিন্তু দুই বেলার একবেলাও যাহাদের জোটে না তাহাদের কাছে ভগবানের কথা কোন্ মুখে বলিব? তাহাদের কাছে ভগবান একমাত্র অন্নরূপেই দেখা দিতে পারেন। অন্ন কৃষকের ক্ষেতে জন্মে। অন্নের সহিত তাহাদের একটু ঘি জোটে তাই না তাহাদের হাতে চরকা দিয়াছি। আর এই যে আমাকে কটি-বস্ত্রে দেখিতেছেন তার কারণ আমি অর্ধভুক্ত অর্ধ-উলঙ্গ মূক জনতার প্রতিনিধি। তাহাদের প্রতিনিধিরূপেই এখানে আসিয়াছি।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৫-১০-৩১]

অগণিত জনতার আমি একজন। তাহাদের আমি জানি এই দাবি আমি রাখি। অষ্টপ্রহর আমি তাহাদের সঙ্গে। তাহারাই আমার দিবস-রজনীর একমাত্র ভাবনা, কারণ মূক জনতার হৃদয়-

নিবাসী ভগবান ব্যতীত অন্য ভগবান আমি মানি না। ভগবানের সান্নিধ্য তাহারা অনুভব করে না; আমি করি। আর এই অগণিত জনতার সেবার মাধ্যমেই আমি ভগবানরূপী সত্যের বা সত্যরূপী ভগবানের আরাধনা করি।

[হরিজন, ১১-৩-৩৯]

আমি বলি, একদৃষ্টিতে আমরা সকলেই চোর। আমার আশু কাজে লাগিবে না এমন কিছু লই ও সঞ্চয় করিয়া রাখি তো কাহাকেও আমি তাহা হইতে বঞ্চিত করি অর্থাৎ চুরি করি। স্বভাবের অলঙ্ঘনীয় ধর্মানুসারে আমাদের দৈনন্দিন অভাব পূরণোপযোগী দ্রব্য নিয়ত উৎপন্ন হয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কিছু আমরা কেহ যদি না লইতাম তাহা হইলে এই জগতে দারিদ্র্য থাকিত না, অনাহারে কেহ মরিত না।

[মহাত্মা গান্ধী (১৯১৮), পৃঃ ১৮৯]

ভারতের কোটি কোটি লোকের এক বেলার বেশী জোটে না; যাহা জোটে তাহাতে না আছে ঘি, না আছে আর-কিছু, সেরেফ নুন-ভাত। এই অগণিত লোকের খাওয়া-পরার পরে যাহা বাঁচিবে তাহাতেই বস্তুত আমাদের অধিকার, তদতিরিক্তে নহে। তাহাদের যাহাতে আহার পোষণ আবরণ মেলে এভাবে আমাদের প্রয়োজন নিয়মন করা উচিত, দরকার হইলে কৃচ্ছ্রতা বরণ করা উচিত, এ কথাটা না বুঝিলে আহাম্মকি হইবে।

[মহাত্মা-গান্ধী (১৯১৮), পৃঃ ১৮৯]

৯

ভগবানের কণ্ঠস্বর

ভগবানের কণ্ঠস্বর শোনার দাবি এই আমার প্রথম নয়। দুর্ভাগ্য যে ফল দ্বারা ভিন্ন এই দাবি সপ্রমাণ করার কোন উপায় আমার জানা নাই। তাঁর সৃষ্ট জীবের হাতে যদি তিনি প্রমেয় হইতেন তো ভগবান আর ভগবান থাকিতেন না। কিন্তু যে স্বেচ্ছায় তাঁর গোলাম হইয়াছে তাহাকে কঠোরতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার শক্তি তিনি দেন। পঞ্চাশ বছরের অধিককাল এই কড়ায়-গণ্ডায় উসুলকারী প্রভুর আমি অনুগত ভৃত্য। যত দিন যাইতেছে তাঁর কণ্ঠস্বর আমার তত বেশী স্পষ্ট ধরা পড়িতেছে। অতি ঘোর বিপদেও কখন তিনি আমায় পরিত্যাগ করেন নাই। আমি ডুবিতে বসিয়াছি, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তিনি আমাকে বাঁচাইয়াছেন; আমার স্বাতন্ত্র্য কাড়িয়া লইয়াছেন। যতই আমি আত্মসমর্পণ করিতেছি ততই আমার আনন্দ নিবিড় হইতেছে।

[হরিজন, ৬-৫-৩৩]

কাহারও কাহারও সঙ্গে অন্তর-পুরুষ কথা কয়, এ কথা অসম্ভব বলিয়া কেহ উড়াইয়া দিয়াছে বলিয়া জানি না। অন্তরবাণী যেমন বলায় তেমন বলি—কোন লোকের এই দাবি যদি সত্য প্রমাণিত হয় তো তাহা জগতের পক্ষে লাভজনক হইবে। এ দাবি অনেকে করে ও করিবে কিন্তু সকলে তাহা প্রমাণ করিতে পারিবে না। পাছে লোকে মিথ্যাচার করে এই ভয়ে এই দাবি চাপা দেওয়া যায় না, দেওয়া উচিত হইবে না। অনেকের আচরণ যদি অন্তরবাণীর অনুরূপ হইত তো কথা ছিল না, ভয় ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত

কপটাচারের কোন প্রতিষেধ নাই। অনেকে গুণের ভান করিবে এই ভয়ে গুণ কখনও চাপা দিতে নাই। অন্তরবাণী শোনার দাবি যুগে যুগে সর্ব দেশে কিছু লোকে করিয়াছে কিন্তু তাহাদের ক্ষণস্থায়ী কার্যকলাপে পৃথিবী রসাতলে যায় নাই। দীর্ঘদিনব্যাপী কঠোর সংযম সাধনা করিলেই মাত্র ওই স্বর শোনা যায়। আর যখন শোনা যায় তখন বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে তাহা অন্তরবাণী। লোককে চিরদিন ঠকানো যায় না। অতএব আমার মত দীন ব্যক্তি যদি নিজ অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করিতে ক্ষান্ত না হয় এবং অন্তরবাণী শোনার দাবি (যাহা সত্য সত্যই শুনিয়াছে বলিয়া সে বিশ্বাস করে) সাহসভরে করে তো দুনিয়া ছারখারে যাইবে না।

[হরিজন, ১৮-৩-৩৩]

আমার কাছে ভগবানের বাণী বিবেকের বাণী সত্যের বাণী অথবা অন্তর-ধ্বনি বা 'ধীর ক্ষীণ কণ্ঠ' যাহাই বলুন সবই এক। আকার আমি দেখি নাই। সে চেষ্টাও আমি কখনও করি নাই কারণ আমার বরাবরের বিশ্বাস, ভগবান নিরাকার। কিন্তু আমি যাহা শুনিয়াছি সেই স্বর যেন অতি দূরের অথচ একান্ত নিকটের মনুষ্যকণ্ঠে উচ্চারিত ধ্বনির মতই সুস্পষ্ট কোন লোক যেন আমার সঙ্গে কথা বলিতেছে—এমনই সুস্পষ্ট—যে অস্বীকার করার উপায় নাই। স্বপ্নাবেশে আমি এই স্বর শুনিয়াছি তাহা নয়। ওই স্বর শোনার আগে আমার ভিতরে এক অতীব ভয়ানক মন্থন চলিয়াছিল। অকস্মাৎ সেই স্বর ভাসিয়া আসিল। শুনিলাম, নিঃসংশয়ে বুঝিলাম এই সেই স্বর; আলোড়ন মিলাইয়া গেল। শান্তি অনুভব করিলাম। তদনুসারে সংকল্প করিলাম; অনশনের দিন ও ক্ষণ ধার্য হইল। মনপ্রাণ আনন্দে ভরিয়া গেল। মধ্যরাত্র ১১-১২ টার মধ্যে ইহা ঘটে। স্ফূর্তি

অনুভব করিলাম আর এই বিষয়ে যাহা বলার লিখিলাম। তাহা আপনারা সম্ভবত দেখিয়া থাকিবেন।

[হরিজন, ৮-৭-৩৩]

আমি সত্যই সেই স্বর শুনিয়াছি আর তাহা বিকারী মনের প্রলাপ নয় ইহার অধিক প্রমাণ আর আমি কি দিতে পারি? অবিশ্বাসীর অবিশ্বাস দূর করার অন্য প্রমাণ আমার নাই। ইহা আত্মপ্রবঞ্চনা বা ভ্রান্তি এই কথা স্বচ্ছন্দে আপনি বলিতে পারেন। হয়ত বা তাহাই। এই কথা খণ্ডন করার মত প্রমাণ আমার নাই, তবে এ কথা বলিতে পারি যে যাহা শুনিয়াছি তাহা যে সত্যই ভগবাণের বাণী আমার এই বিশ্বাস সমস্ত জগৎ সমস্বরে উল্টাটি বলিলেও টলিবে না।

[হরিজন, ৮-৭-৩৩]

কিন্তু কিছু লোকে মনে করে যে স্বয়ং ভগবানই আমাদের কল্পনার সৃষ্টি। এই কথা যদি ঠিক হয় তো কোন কিছুরই সত্তা নাই, সবই কল্পনা। তাহা হইলেও যত দিন আমার মনোবুদ্ধি বিচার ও হৃদয় এই কল্পনার প্রভাবে প্রভাবিত হইবে ততদিন তদনুসারে না চলিয়া আমার উপায় নাই। একান্ত সত্য বস্তুও আপেক্ষিক সত্য মাত্র। আমার নিজ অস্তিত্ব অপেক্ষাও ওই স্বর আমার কাছে অধিক সত্য। উহার নির্দেশ হইতে আমি কিংবা অন্য কেহ কখনও বঞ্চিত হয় নাই।

[হরিজন, ৮-৭-৩৩]

আর ইচ্ছা করিলে যে কেহ ওই স্বর শুনিতে পারে। সকলের ভিতরেই তাহা রহিয়াছে। কিন্তু অন্য সকল জিনিসের মত ইহার জন্যও নির্দিষ্ট পথে তৈয়ার হইতে হয়।

[হরিজন, ৮-৭-৩৩]

ভ্রমের (hallucination-এর) কথাই উঠে না। এক নিছক বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা আমি সহজ ভাষায় বলিয়াছি। সেই ইচ্ছা থাকিলে ও তদনুরূপ অধিকার (তাহা যে কি তাহা বোঝা ও অর্জন করা নেহাতই সহজ যদি সেই সংকল্প থাকে) অর্জন করিলে যে কেহ সেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে। এ কথাই কেবল আমি বলিব, "কাউকে বিশ্বাস করতে হবে না, নিজকে বিশ্বাস করুন। অন্তর-বাণী শোনার চেষ্টা অবশ্য আপনাকে করতে হবে। 'অন্তর-বাণী'-শব্দে আপত্তি হয় তো 'বিচারের অনুজ্ঞা' বলতে পারেন আর তদনুসারে আপনার চলা উচিত। আর ভগবানের দোহাই না দেন তো কোন কিছুর দোহাই তো দেবেন-ই নিশ্চিত আর অন্তে তাই নেবে ভগবানের রূপ, কারণ পরম ভাগ্যের কথা, ভগবান ব্যতীত এই বিশ্বে আর কেউ বা কিছু নাই।" এ কথাও বলিব যে অন্তর-বাণীর প্রেরণায় কাজ করার দাবি যাহারা করে তাহাদের সবারই সে প্রেরণা নাই। যাহাই বলেন, অন্য যে কোন শক্তি অর্জনের জন্য যেমন অনেক প্রযত্ন ও অনেক শিক্ষানবিসী করিতে হয়, বিবেকের কণ্ঠধ্বনি শোনার শক্তি অর্জন করার জন্যও তদ্রূপ বা ততোধিক প্রযত্ন ও শিক্ষানবিসী করিতে হয়। আর হাজারো দাবিকারীর দুই চারজনও যদি তাহাদের দাবি সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হয় তবে মেকী দাবিদার গজায় গজাক, থাকে থাকুক, তাহাতে লাভ ছাড়া লোকসান নাই। ভাগবত প্রেরণার অথবা অন্তর-বাণীর ইঙ্গিতে কাজ করার ঝুটা দাবি কেহ করে তো তাহার দশা পার্থিব কোন রাজার জাল চাপরাসে কাজ করার অপরাধে অপরাধী দাবিদারের অপেক্ষা অধিক শোচনীয় হইবে। ধরা পড়িলে শেষোক্ত দাবিদার কেবল দৈহিক যাতনা ভোগ করিয়া নিষ্কৃতি পাইবে কিন্তু প্রথমোক্ত দেহে মরিবে ও আত্মায় খোয়াইবে। উদার সমালোচকগণ প্রবঞ্চনার আরোপ আমার উপর করেন না ; তাঁহাদের ইঙ্গিত এই যে, আমি খুব সম্ভব

কোন ভ্রম (hallucination) বশে কাজ করিতেছি। তাহাও যদি হয় তো মিথ্যা দাবি করা অপেক্ষা সে স্থলে আমার অপরাধ বড় কম হইবে না। আমি দীন সেবক—এই আমার দাবি। দীন সেবকের যার-পর-নাই সতর্ক হইতে হয়, মানসিক সমতা রক্ষা করিতে হয়, শূন্য হইতে হয়, তবে না ভগবান তাহার পথের কাণ্ডারী হন! ইহার বেশী বলা নিরর্থক।

[দি বম্বে ক্রনিকল, ১৮-১১-৩৩]

১০

ভগবানোপলব্ধি

আমার কাছে সত্য পরাতত্ত্ব। এই পরাতত্ত্বের গুহায় আরও নানা তত্ত্ব নিহিত। এই সত্য মানে কেবল সত্য কথন নয়, সত্য চিন্তনও বটে। আর ইহা আমাদের ধারণার আপেক্ষিক সত্যও নহে; ইহা পরা-সত্য, শাশ্বত বিধি অর্থাৎ ভগবান। ভগবানের নাম অনন্ত কেননা তাঁর রূপ অনন্ত। এই অনন্ত নাম ও অনন্ত রূপের কথা যখন ভাবি, বিস্ময় ও সম্ভ্রমে অভিভূত হই, ক্ষণেকের তরে বিহ্বল ও হতবাক্ হইয়া যাই। কিন্তু সত্যরূপেই কেবল আমি ভগবানের উপাসনা করি। তাঁকে আমি পাই নাই, পাওয়ার চেষ্টা করিতেছি। এই সাধনার সিদ্ধিকল্পে যে কোন প্রিয় বস্তু জলাঞ্জলি দিতে আমি প্রস্তুত। ইহার জন্য জীবন দিতে হয় তো তাহাও আমার বিশ্বাস আমি দিতে পারিব কিন্তু যতদিন না এই পরা-সত্যের দর্শন মিলিবে ততদিন আপেক্ষিক সত্যই (যেমনটা আমি তাহা উপলব্ধি করিয়াছি) হইবে আমার আশ্রয়স্থল, আমার পথের কাণ্ডারী, আমার ধর্ম, আমার বিপদ-বারণ। এই পথ ঋজু, সংকীর্ণ এবং ক্ষুরধার তীক্ষ্ণ হইলেও আমার কাছে এই পথই হ্রস্বতম ও সুলভতম। এই পথ হইতে

তিলমাত্রও বিচলিত হই নাই তাই আমার পর্বতপ্রমাণ ভুলও আমার কাছে তুচ্ছ মনে হইয়াছে। কারণ এই পথ আমাকে পতন হইতে রক্ষা করিয়াছে আর উপলব্ধি অনুপাতে আমি নিত্য আগাইয়া চলিয়াছি। এই অগ্রগতির পথে অনেক সময় পরা-সত্যের, ভগবানের চকিত দর্শন আমার লাভ হইয়াছে। আর দিন দিন এই বিশ্বাস আমার দৃঢ় হইতেছে যে এক তিনিই নিত্য আর সব কিছু অনিত্য।

[আত্মকথা (১৯৪৮), পৃঃ ৬-৭]

এই বিশ্বাসও দিন দিন আমার দৃঢ় হইতেছে যে, যাহা আমি পারি শিশুও তাহা পারে, আর এ কথা বলার মত সুসঙ্গত কারণও আমার আছে। সত্যোপলব্ধির সাধনসমূহ যেমন সহজ তেমনই আবার কঠিন। উদ্ধত লোকের কাছে এই সব সাধন অতীব কঠোর মনে হইতে পারে আর নিষ্পাপ শিশুর কাছে অতীব সহজ। সাধকের ধূলিকণা সম বিনয়নম্র হইতে হয়। দুনিয়া ধূলিকণাকে পায়ে দলে ঃ সত্যের সাধককে সেই ধূলিকণারও পায়ের ধূলা হইতে হইবে। কেবল তখনই, তার আগে নয়, সত্যের চকিত দর্শন তাহার লাভ হইবে।

[আত্মকথা (১৯৪৮), পৃঃ ৬-৭]

ভগবানে এই যে বিশ্বাস তাহা বুদ্ধির যাহা অতীত সেই প্রত্যয়ে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ হওয়া চাই। এমনকি যাহাকে উপলব্ধি বলা হয় তাহারও মূলে প্রত্যয়ের অঙ্কুর কিছুটা থাকে, নইলে তাহা টিকিতে পারে না। স্বভাবধর্মেই তাহা হইতে বাধ্য। দেহের মর্যাদা লঙ্ঘন করে কাহার সাধ্য ? আমি মনে করি, পূর্ণ উপলব্ধি এই দেহে সম্ভবপর নয়। আর সেই দরকারও নাই। মানুষের পক্ষে যে আধ্যাত্মিক স্তরে ওঠা সম্ভব সেই স্তরে ওঠার জন্য চাই অবিচল জ্বলন্ত বিশ্বাস, তাহার অধিক

কিছুর দরকার নাই। ভগবান আমাদের এই পার্থিব দেহাবরণের বাইরে নহেন। অতএব বাহ্য প্রমাণের মূল্য (আদৌ থাকে তো) বড় একটা নাই। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে বলিয়া ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কখনও তাঁকে অনুভব করা যাইবে না। ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক হইলেই কেবল তাঁকে উপলব্ধি করা যাইবে। আমাদের অভ্যন্তরে ভাগবত স্বর নিয়ত গুঞ্জরিত হইতেছে। কিন্তু উদ্ধত ইন্দ্রিয়সমূহের কোলাহলে সেই মৃদু গুঞ্জরণ ডুবিয়া যায়। স্পর্শগম্য, শ্রুতিগ্রাহ্য কোন কিছুর মত তা নয়, তাহা অপেক্ষা অনন্ত-গুণ শ্রেষ্ঠ।

[হরিজন, ১৩-৬-৩৬]

আমি দেখিয়াছি আর বিশ্বাস করি যে ভগবান দেহে দেখা দেন না, মূর্ত হন কর্মে। নইলে ঘোর বিপদে তিনি মানুষকে রক্ষা করেন কেন!

[হরিজন, ১৩-৬-৩৬]

বারংবার একই রূপ অভিজ্ঞতার ফলে আমার এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হইয়াছে যে, সত্য ব্যতীত অন্য ভগবান নাই…সত্যের যে ক্ষণিক চকিত দর্শন পাইয়াছি তাহা হইতে সত্যের অবর্ণনীয় মহাদ্যুতির ধারণা করা যাইবে না…সেই জ্যোতি আমাদের প্রতিদিনের দেখা সূর্যের জ্যোতি অপেক্ষা লাখো-গুণ তীব্র। বস্তুত যাহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা সেই মহাদ্যুতির নিরতিশয় ক্ষীণ রশ্মিমাত্র। নানা পরীক্ষার ফলস্বরূপ নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে অহিংসার পূর্ণ উপলব্ধি হইলেই কেবল সত্যের পূর্ণ দর্শন লাভ হয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৭-২-২৯]

ভগবানের অভিপ্রায়ের কোন বিশেষ প্রকাশ আমাতে হয় নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রত্যেকের কাছে তিনি নিত্য নিজকে ব্যক্ত করেন কিন্তু বিবেকের ওই কণ্ঠস্বরকে আমরা আমল দেই না। পথ-প্রদর্শক আলোকবর্তিকা হইতে আমরা চক্ষু সরাইয়া লই, চক্ষু মুদ্রিত করি। তাঁর সর্বব্যাপী সান্নিধ্য আমি অনুভব করি।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৫-৫-২১]

ঈশ্বরোপলব্ধি মানুষের অন্তিম লক্ষ্য। আমাদের সামাজিক রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব কর্ম ভগবদ্‌দর্শনরূপ এই অন্তিম লক্ষ্য-প্রাপ্তির নিমিত্ত নিয়োজিত হওয়া চাই। মানুষের প্রত্যক্ষ সেবা এই প্রযত্নের এক আবশ্যিক অঙ্গ। কেননা ভগবানের সৃষ্ট জীবে তাঁকে দেখা ও তাহাদের সহিত একাত্মতা অনুভব করা ছাড়া তাঁকে পাওয়ার উপায় নাই। সকলের সেবা দ্বারাই মাত্র তাহা সম্ভব। আমি সমগ্রের এক অংশ। মানবসমাজকে এড়াইয়া তাঁকে পাওয়ার উপায় নাই। আমার দেশবাসীরা আমার নিকটতম প্রতিবেশী। তাহারা এতই অসহায় উদ্যমহীন ও নিষ্ক্রিয় বনিয়া গিয়াছে যে তাহাদের সেবায় আমার সমগ্র শক্তি নিয়োগ না করিলে নয়। যদি বুঝিতাম যে হিমালয়ের গুহায় গেলে তাঁর দর্শন মিলিবে তো কবেই চলিয়া যাইতাম। কিন্তু আমি জানি মানুষকে বাদ দিয়া তাঁকে পাওয়া যায় না।

[হরিজন, ২৯-৮-৩৬]

ঘোর অন্ধকারে আমরা আবৃত। অভিশাপ তাহা নয়, বর। এক পদক্ষেপ পরিমিত পথমাত্র দেখার শক্তি তিনি আমাদের দিয়াছেন। সেই এক পা পথ তাঁর আলোতে আলোকিত হয় তো যথেষ্ট। তখন নিউম্যানের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া গাইতে পারিব, 'এক পদেই

দাস তুষ্ট'। আর অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে পরবর্তী পদক্ষেপ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারিব। অন্য কথায়, নিবিড় অন্ধকার তত নিবিড় নয় যতটা আমরা মনে করি। কিন্তু যখন ওই এক পদের অধিক দেখার জন্য অধৈর্য হই তখন তাহা নিবিড় মনে হয়।

[হরিজন, ২০-৪-৩৪]

আমি ও আপনি এই ঘরে বসিয়া আছি এ কথায় যেমন সংশয় নাই, ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও তেমন সংশয় নাই। আর নিজের সম্বন্ধে বলিতে পারি যে বাতাস জল ছাড়া আমি বাঁচিলেও বাঁচিতে পারি কিন্তু তাঁকে ছাড়া একেবারেই নয়। আপনি আমার চক্ষু তুলিয়া ফেলিতে পারেন, তাহাতে আমি মরিব না ; আপনি আমার নাক কাটিয়া ফেলিতে পারেন, তাহাতেও আমি মরিব না। কিন্তু আমার ঈশ্বর-বিশ্বাস নাশ করিয়াছেন তো আমি গিয়াছি। কুসংস্কার একে আপনি বলিতে পারেন কিন্তু আমার স্বীকার করিতে লজ্জা নাই যে, এই কুসংস্কারই আমার পরম আশ্রয়। এই অবলম্বনের শরণ লওয়ার শিক্ষা পাই আমি এক বৃদ্ধা ধাত্রীর কাছে।

[হরিজন, ১৪-৫-৩৮]

ভগবানের মত কঠোর প্রভু আমি জগতে আর দেখি নাই। তন্ন তন্ন করিয়া তিনি পরীক্ষা করেন। আপনার বিশ্বাস ও দেহ হার মানিতে বসে তো এভাবে নয় তো সেভাবে তিনি আপনার সাহায্যের জন্য দৌড়িয়া আসেন আর দেখাইয়া দেন যে বিশ্বাস হারাইতে নাই, দেখাইয়া দেন যে আপনার ডাকে সাড়া দিতে তিনি এক পায়ে খাড়া, তবে আপনার কথা মত নয়, তাঁর বিচার মত। এমনটাই আমি দেখিয়াছি। ঘোর বিপদে কখনও তিনি আমায় পরিত্যাগ করিয়াছেন এমনটা কস্মিনকালেও ঘটে নাই।

[স্পীচেস্ অ্যাণ্ড রাইটিংস অব্ মহাত্মা গান্ধী (১৯৩৩), পৃঃ ১০৬৯]

১১

অহিংসার পথ

সত্যের পথ অপ্রশস্ত। তেমনি তাহা সরল। অহিংসার পথও তাহাই। এ যেন খড়্গের ফলার উপর দাঁড়াইয়া তাল সামলানো। একাগ্র হইলে খেলোয়াড় দড়ির উপর দিয়া হাঁটিতে পারে। কিন্তু সত্য ও অহিংসার পথে চলার জন্য ঢের বেশী একাগ্রতা দরকার। এতটুকু অসতর্ক হইয়াছেন কি নীচে পড়িয়াছেন। নিরলস প্রযত্ন দ্বারাই কেবল সত্য ও অহিংসার উপলব্ধি সম্ভব।...

অহিংসাকে যেরূপ ঠুনকো জিনিস বলিয়া ধরা হইয়াছে অহিংসা তেমন ঠুনকো নয়। কোন জীবকে হতাহত না করা সত্যের এক অঙ্গ বটে। কিন্তু সত্যের তাহা নেহাত তুচ্ছ অঙ্গ। কুচিন্তা করিয়াছ তো, অযথা ব্যস্ত হইয়াছ তো, মিথ্যা বলিয়াছ তো, ঘৃণা করিয়াছ তো বা কাহারও অমঙ্গল কামনা করিয়াছ তো অহিংসা-ধর্ম হইতে স্খলিত হইয়াছ। যে জিনিসে অন্যের দরকার তা সংগ্রহ করিয়া রাখ তো অহিংসার বিপরীত কার্য হইবে। কিন্তু আমরা প্রতিদিন যাহা খাই তাহাতেও পৃথিবীর কাহারও না কাহারও প্রয়োজন রহিয়াছে। আমরা যেখানে দণ্ডায়মান তাহা কোটি কোটি জীবাণুর বাসস্থল। আমাদের উপস্থিতিতে তাহারা আহত হইতেছে। তবে উপায়? আত্মহত্যা করিব কি? তাহাতেও নিষ্কৃতি নাই। কারণ এ কথা যদি আমরা বিশ্বাস করি আর বিশ্বাস তো আমরা করিই যে, যতদিন দেহাসক্তি দূর না হইবে ততদিন মৃত্যুর পরে আসক্তি বারবার নূতন ঘর বাঁধিবে। দেহের আসক্তি দূর হইলে দেহ ঝরিয়া পড়িবে। সর্ব আসক্তি হইতে এই যে মুক্তি, সত্যের রূপে তাহাই ঈশ্বরোপলব্ধি। এরূপ উপলব্ধি ঝট্‌ করিয়া আসার নয়। দেহের মালিক আমরা নহি।

দেহ যতদিন আছে, মনে রাখিতে হইবে আমরা উহার অছিমাত্র। সেই ব্যাপারকে এই দৃষ্টিতে দেখিলে একদিন এই দেহের বোঝা হইতে মুক্তি পাওয়া যাইবে। দেহের দুর্বলতার কথা উপলব্ধি করিয়া সর্ব শক্তি নিয়োগে আদর্শে পৌঁছিবার নিরন্তর প্রযত্ন করা চাই।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে এ কথা সম্ভবত স্পষ্ট হইয়াছে যে অহিংসা ছাড়া সত্যের সাধনা ও উপলব্ধি সম্ভব নয়।

সত্য ও অহিংসার সম্বন্ধ এমন নিবিড় যে এক হইতে অন্যকে পৃথক করা যায় না। সত্য ও অহিংসা মুদ্রার বা অনঙ্কিত চাকতির এ-পিঠ আর ও-পিঠ। কে বলিবে কোন্‌টি মুখের দিক আর কোন্‌টি পিঠের? তাহা হইলেও, অহিংসা উপায় আর সত্য উদ্দেশ্য। সদা সাধ্যায়ত্ত না হইলে উপায় উপায়ই নয় আর তাই তো অহিংসা আমাদের পরম ধর্ম। সতর্কভাবে পথ চলিলে গন্তব্য হাতের মুঠায়—দুইদিন আগে বা পাছে। এ কথা বুঝিয়াছি তো অন্তিম বিজয় সম্পর্কে কোন সংশয় নাই। যত বাধাই আসুক, আপাতদৃষ্টিতে যত পরাজয়ই ঘটুক তবুও সত্যের সাধনায় নিরস্ত হইতে নাই, কেননা একমাত্র সত্যই আছে আর ওই সত্যই ভগবান।

[যারবাদা মন্দির হইতে, দ্বিতীয় অধ্যায়]

অহিংসা অন্যতম মহা সক্রিয় শক্তি। তাহা অন্তর-নিহিত আত্মিক বা ঈশ্বরী শক্তি। মানুষ অপূর্ণ বলিয়া ওই সত্তার পূর্ণ ধারণা করা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। তাঁর পূর্ণ তেজ সহ্য করার ক্ষমতা মানুষের নাই। কিন্তু ওই তেজের তিলমাত্রও ভিতরে ক্রিয়মাণ হয় তো অঘটন ঘটে। সূর্যের তেজ বিশ্বে প্রাণের স্পন্দন জাগায়। কিন্তু ওই সূর্যেরই অতি নিকটে গিয়াছ তো পুড়িয়া খাক্ হইবে। ঈশ্বরীয় সত্তা সম্পর্কেও ঠিক ওই কথা। অহিংসার উপলব্ধি অনুসারে মানুষ ঐশী বিভূতি লাভ করে। কিন্তু ভগবানের সমান হওয়া কখনই সম্ভব নয়। অহিংসার

ক্রিয়া তেজস্ক্রিয়ের ন্যায়। উহার রতিমাত্র দুষ্ট-উপগ্রন্থিতে প্রয়োগ করিলে দেখা যাইবে, যতদিন না রুগ্ন কলাসমষ্টি পূর্ণ নিরাময় হইয়াছে ততদিন উহার নীরব ক্রিয়া নিরন্তর চলিবে। তদ্রূপ তিলমাত্র প্রকৃত অহিংসাও চক্ষুর অগোচরে সূক্ষ্মভাবে নীরব ক্রিয়া করে এবং সমাজ-দেহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া উহার রূপান্তর ঘটায়।

[হরিজন, ১২-১১-৩৮]

নম্রতাশূন্য সত্য সত্যের মহা পরিহাস। সত্যের সাধনা যে কী কঠিন তাহা সত্যের সাধক জানে। তাহার তথাকথিত অপূর্ব সাফল্যের স্তুতি দুনিয়া কীর্তন করে। তাহার অজস্র পদস্খলনের খবর জগৎ কতটুকু রাখে! সত্যের সাধক তপাগ্নিতে শুদ্ধ-পবিত্র হয়। নম্র না হইয়া তাহার চারা নাই। যে সমগ্র জগতকে, যে লোক খোলাখুলি তাঁহার শত্রুতা করে তাহাকে পর্যন্ত, ভালবাসিতে চায় তাহার নিজ শক্তিতে তাহা যে কতদূর অসম্ভব সে কথা সে জানে। অহিংসার অ আ ক খ শিখিতে হইলে ধূলিকণার সমান হইতে হইবে। প্রেম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নম্রতাও যদি না বাড়ে তো সবই ব্যর্থ···অহং-এর লেশও যাহাতে আছে ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন তাহার ঘটে না। ভগবানকে দেখিতে হইলে শূন্য হইতে হইবে। বাত্যাবিক্ষুব্ধ এই বিশ্বে কাহার সাহস বলিবে, 'আমি জয়ী হয়েছি?' বিজয়ী হন ভূতান্তরাত্মা ভগবান, ভূত কস্মিনকালেও নয়। ভৌতিক জগতের বেলায় যাহা সত্য, আধ্যাত্মিক জগতের ব্যাপারেও তাহা সত্য। পার্থিব যুদ্ধে জয়লাভের মত ক্ষণস্থায়ী ব্যাপারের জন্য ইউরোপ যদি লাখো লোককে যমের ঘরে পাঠাইতে পারে তো আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে পূর্ণ নিখুঁত দৃষ্টান্ত সংস্থাপনের জন্য আধ্যাত্মিক সংগ্রামে যদি লক্ষ লক্ষ লোককে প্রাণ দিতে হয় তো আশ্চর্যের কি আছে?

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৫-৬-২৫]

অহিংসা অপেক্ষা বড় শক্তি মানুষের আর কিছু নাই। মানব-বুদ্ধি-উদ্‌ভাবিত যে কোন শক্তিধর মারণাস্ত্র অপেক্ষা ইহা অধিক শক্তিশালী। বিনাশ মানুষের ধর্ম নয়। মারিতে নয়, মরিতে প্রস্তুত বলিয়া মানুষ নিরুদ্‌বেগে বাস করে। নরহত্যা বা নরাঘাত মাত্রই, উদ্দেশ্য উহার যা-ই হোক, মানবগোষ্ঠী-বিরোধী কাজ—অপরাধ।

[হরিজন, ২০-৭-৩৫]

দয়া, অহিংসা, প্রেম ও সত্যের প্রকৃত পরীক্ষা ক্রূরতা, হিংসা, দ্বেষ ও অসত্যের সম্মুখীন হওয়াতে।

এ কথা সত্য হইলে নরহন্তার সম্মুখে অহিংসা নিষ্ফল এ কথা বলা ভুল হইবে। বলিতে পারেন যে নরহন্তার কাছে অহিংসার পরীক্ষা দিতে যাওয়া মৃত্যুকে ডাকিয়া আনারই নামান্তর। কিন্তু এখানেই তো অহিংসার যথার্থ পরীক্ষা। উপায় নাই বলিয়া কোন লোক নেহাত অসহায়ভাবে জীবন দেয় তো বলা যাইবে না যে সে অহিংসার পরীক্ষায় পাস হইয়াছে। যে লোক আততায়ীর হাতে খুন হওয়ার সময় আততায়ীর প্রতি ক্রোধ করে না, উল্টা তাহাকে ক্ষমা করার জন্য ভগবানের কাছে যাচ্ঞা করে সে লোক প্রকৃত অহিংস। ইতিহাস বলে যীশু এরূপ করিয়াছিলেন। ক্রুশে যখন তাঁহার প্রাণবায়ু বাহির হইবে তখন তিনি নাকি বলিয়াছিলেন, 'প্রভো, এদের ক্ষমা করো, এরা কি করছে এরা জানে না।' এরূপ দৃষ্টান্ত অন্য ধর্মেও পাওয়া যায়। তবু যে যীশুর কথা বলিলাম তাহার কারণ এই উক্তি জগৎ-প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

আমাদের অহিংসা এতটা উচ্চস্তরে ওঠে নাই, সে স্বতন্ত্র কথা। নিজেদের ত্রুটির দরুন বা অনভিজ্ঞতার কারণে ওই স্তরে পৌঁছিতে পারি নাই বলিয়া অহিংসার মান নীচু করিলে মারাত্মক ভুল করা হইবে। আদর্শের সম্যক্ জ্ঞান ব্যতীত আদর্শে পৌঁছানোর আশা

কস্মিনকালেও নাই। অতএব অহিংসার শক্তি যে কি তাহা বোঝার জন্য আমাদের বুদ্ধির শরণ লইতে হইবে।

[হরিজন, ২৮-৪-৪৬]

অহিংসা ব্যাপক ধর্ম। হিংসার দাবানলে ঘেরা আমরা অসহায় জীব। জীবন নাশ না করিলে জীবন চলে না এ কথা গভীর তাৎপর্য-পূর্ণ। সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ বাহ্য হিংসার হাত হইতে মানুষের ক্ষণেকের তরেও নিষ্কৃতি নাই। মানুষের বাঁচিয়া থাকার—তাহার আহার-পান, চলাফেরার—মানেই কিছুটা হিংসা, কিছু জীবননাশ, যত কমই তাহা হোক। তবে উপায়? উপায় এই: এমতাবস্থায় সত্যের সাধক সব কিছু কর্ম যদি করুণার প্রেরণা হইতে করে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবের প্রাণনাশ হইতে সাধ্যানুসারে বিরত থাকে, উল্টা উহাদের জীবন রক্ষা করিতে চেষ্টা করে আর এভাবে হিংসার নাগপাশ হইতে মুক্ত হওয়ার নিরন্তর প্রযত্ন করে, তবে বলা যাইবে যে সে ঠিক ঠিক তাহার ব্রত পালন করিয়াছে। তাহার আত্ম-সংযম ও করুণা দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে, কিন্তু বাহ্য হিংসার হাত হইতে কখনও তাহার পূর্ণ নিষ্কৃতি নাই।

[আত্মকথা (১৯৪৮), পৃঃ ৪২৭-২৮]

তা ছাড়া, অহিংসার মূলে সর্বজীবের একত্ব ভাব আছে বলিয়া কোথাও কেহ ভুল করিলে তাহার ফল অন্য সবেতে বর্তে, তাই পূর্ণ অহিংসাপরায়ণ হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখার নিমিত্তই সমাজকে হিংসা করিতে হয় সুতরাং মানুষ যতদিন সমাজের অঙ্গ থাকিবে ততদিন সমাজের হিংসার ভাগীও তাহাকে হইতে হইবে। কোন দুই দেশে যুদ্ধ বাধে তো অহিংসার সাধকের কর্তব্য হইবে যুদ্ধ থামানো। এই কর্তব্য পালনে যে লোক

অসমর্থ, যুদ্ধের বিরোধিতা করার শক্তি যাহার নাই, যুদ্ধের বিরোধিতা করার উপায় যাহার নাই, সে যুদ্ধে যোগ দিতে পারে আর তাহা সত্ত্বেও নিজকে, নিজ দেশকে, বিশ্বকে যুদ্ধ-মুক্ত করার আন্তরিক চেষ্টা করিতে পারে।

[আত্মকথা (১৯৪৮), পৃঃ ৪২৮]

১২

প্রার্থনা—ধর্মের সার

আমি মনে করি, প্রার্থনা ধর্মের প্রাণ, ধর্মের সার। অতএব প্রার্থনা মানব-জীবনের নিগূঢ়তম বস্তু হওয়া চাই, কারণ ধর্ম ছাড়া মানুষের চলে না। ধর্মের ধার আমরা ধারি না কেহ কেহ বুদ্ধির অভিমানে এ কথা বলে। নাক নাই তবু শ্বাস নিই বলারই মত এ কথা। বুদ্ধি, উপজ্ঞা বা কুসংস্কার যাহার বশেই হোক মানুষ বিধাতার সহিত সম্বন্ধ জোড়ে। উগ্র অজ্ঞাবাদী অথবা নিরীশ্বরবাদীও কোন না কোন নৈতিক বিধির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে এবং মনে করে যে উহার পালনে হিত হয় আর লঙ্ঘনে অহিত। ব্রাড্‌ল নাস্তিক ছিলেন, এ কথা সুবিদিত। নির্ভয়ে তিনি তাঁর নিগূঢ় বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত করিতেন। আর সে জন্য তাঁহাকে অশেষ লাঞ্ছনা ভুগিতে হইত। কিন্তু ওই যাতনা তিনি আনন্দে বরণ করিতেন: বলিতেন, সত্যই সত্যের পুরস্কার। তাহা বলিয়া সত্য পালনের আনন্দানুভূতি তাঁহার ছিল না তাহা নয়। এই আনন্দ পার্থিব কিছু হইতে মেলে না, মেলে ভগবানের ধ্যানন-মনন হইতে। তাই তো আমি বলিয়াছি, যে লোক ধর্ম মানে না তাহারও ধর্ম ছাড়া চলে না, চলিতে পারে না।

এখন দ্বিতীয় কথায়—প্রার্থনা জীবনের নিগূঢ়তম বস্তু—সে কথায়

আসি। প্রার্থনা ধর্মের প্রাণবস্তু। প্রার্থনার রূপ দুই—যাচ্ঞা ও ব্যাপক অর্থে ধ্যান-ধারণা। অন্তিম ফল দুইয়েরই এক। যাচ্ঞা করিতে হয় তো নানা অজ্ঞান ও মলিনতার ছোপে মলিন চিত্তকে ধুইয়া শুদ্ধ করার শক্তি যাচ্ঞা করা চাই। অতএব অন্তরের দেব-ভাব জাগ্রত করার জন্য যে লোক আকুল তাহার তো প্রার্থনার শরণ লইতেই হইবে। কিন্তু জিহ্বা বা কানের কসরত প্রার্থনা নয়, স্তোত্রের যান্ত্রিক আবৃত্তিও নয়। আত্মায় যদি সাড়া না জাগে তো হাজারো নাম জপিলেই কি, সবই বৃথা! শুষ্ক হৃদয়ের কথার প্রার্থনা অপেক্ষা আর্দ্র হৃদয়ের নীরব প্রার্থনা ভাল। প্রার্থনা মুমুক্ষু আত্মার বুভুক্ষা নিবারণোপযোগী হওয়া চাই। ক্ষুধার্ত মানুষ যেমন মহা আগ্রহে খায়, হৃদ্‌গত প্রার্থনায় তেমন ক্ষুধিত চিত্ত পরম পরিতোষ লাভ করে। নিজ অভিজ্ঞতা ও সহচরদের অভিজ্ঞতা হইতে এ কথা বলিতে পারি যে, প্রার্থনার পরম শক্তির আশ্চর্য পরিচয় যাহারা পাইয়াছে তাহারা অনাহারে দিনের পর দিন থাকিতে পারিবে কিন্তু প্রার্থনা বিনা এক মুহূর্তও নয়। কারণ প্রার্থনা ছাড়া অন্তরের শান্তি নাই।

এ কথার উপর কেহ বলিতে পারেন, তবে তো জীবনের অনুক্ষণ প্রার্থনা করিতে হয়। ইহাতে সংশয় আছে কি! তবে কিনা মর জগতের ভ্রান্ত জীব আমাদের পক্ষে অন্তর্মুখ হইয়া ক্ষণকাল ধ্যান করাই দুষ্কর হইয়া ওঠে, তখন নিরন্তর তাঁর ধ্যানে মগ্ন থাকিব তাহা তো সম্ভব নয়। তাই দিনের বিশেষ বিশেষ সময়ে কিছুক্ষণের মত সংসারের আসক্তি ভুলিয়া যাওয়ার, বলিব কি, দেহের ঊর্ধ্বে ওঠার ঐকান্তিক প্রয়াস আমরা করি। এইমাত্র আপনারা সুরদাসের ভজন শুনিলেন। ভগবানে লীন হওয়ার জন্য তৃষিত আত্মার তাহা করুণ ক্রন্দন। আমাদের বিচারে তিনি ছিলেন সাধু, সিদ্ধ পুরুষ, কিন্তু তাঁহার নিজ বিচারে তিনি ছিলেন সর্বজনবিদিত পাপাচারী। আমাদের তুলনায় তিনি ছিলেন অনেক অনেক উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে। কিন্তু

ভগবান হইতে তিনি দূরে এই বেদনা তাঁহার অন্তরে এরূপ তীব্রভাবে বিঁধিত যে ঘৃণার ও হতাশার গভীর খেদে ওই কথা* তিনি বলিয়াছেন।

প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তার কথা আমি বলিয়াছি আর তাহাতেই প্রার্থনার মর্মকথা বলা হইয়াছে। লোকসেবা মানুষের জীবনধর্ম; সম্যক্ সজাগ সতর্ক না থাকিলে যথাযথভাবে মানবসেবা করা যায় না। মানুষের অন্তরে ভাল-মন্দের চির-দ্বন্দ্ব চলিতেছে। প্রার্থনারূপ নিশ্চিত আশ্রয়ের শরণ যে না লইবে সে নিঃসন্দেহ ভাসিয়া যাইবে। জীবন যাহার প্রার্থনাময় তাহার নিজের সঙ্গে নিজের ও জগতের সঙ্গে দ্বন্দ্ব থাকে না। আর যে লোক প্রার্থনার ধার না ধারিয়া মামুলী জীবন-ব্যাপারে ডুবিয়া থাকে সে নিজে দুঃখী হয় আর দুনিয়াকে দুঃখী করে। তাই পরকালের লাভ-লোকসানের কথা না-ই বলিলাম, ইহকালের পক্ষেও প্রার্থনা পরম সম্পদ। আমাদের দৈনন্দিন কর্ম সুব্যবস্থিত, নির্বিরোধ ও শান্তিময় করার একমাত্র পথ প্রার্থনা। এই আসল বস্তুর উপর লক্ষ্য স্থির থাকিলে সব কিছু ঠিক চলিবে। চতুষ্কোণের এক কোণ ঠিক হইলে অন্য তিন কোণ আপনা আপনি ঠিক হইয়া যায়।

অতএব প্রার্থনা দিয়া দিন আরম্ভ করুন; প্রার্থনাতে হৃদয় এমন ঢালিয়া দিন যেন উহার রেশ সারা দিন চলে। প্রার্থনা দিয়া দিন শেষ করুন, স্বপ্নে যেন ঘুমের ব্যাঘাত না জন্মে। প্রার্থনার রূপ কি হইবে তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবেন না। রূপ তার যা-ই হোক, ভগবানের চরণে চিত্ত লগ্ন হয় এমনটা হইলেই হইল। কেবল দেখিবেন, মুখে যখন প্রার্থনা চলে অন্তর যেন তখন এদিক-ওদিক ঘুরিয়া না বেড়ায়।

সূর্য, চন্দ্র, তারা ইত্যাদি জগতের যাবতীয় বস্তু কতকগুলি বিধির বিধানে চলে। এই সব নিয়মের শৃঙ্খল না থাকিত তো জগত এক

* মো সম কৌন কুটিল খল কামী।

মুহূর্তও টিকিত না। আপনারা, যাঁহারা লোকসেবাকে জীবনের ব্রত করিয়াছেন, যদি সংযমের (আকারে তাহা যাহাই হোক) ধার না ধারেন তো বিপন্ন হইবেন। প্রার্থনা সেই প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক সংযম। মানুষ যম-নিয়ম মানে তাই সে পশু হইতে ভিন্ন। আমরা যদি সত্যই মানুষের মত উর্ধ্ব-শিরে চলিতে চাই, পশুর মত চারি হাত-পায়ে চলিতে না চাই তো যম-নিয়ম যে কি তাহা বুঝিতে ও স্বেচ্ছায় সেই যম-নিয়মের পথে চলিতে হইবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৩-১-৩০]

১৩

প্রার্থনা কেন ?

প্রার্থনার আদৌ দরকার কি ? ভগবান থাকেন তো কি যে ঘটিয়াছে তাহা কি তিনি জানেন না ? প্রার্থনা বিনা তিনি কি তাঁর কর্তব্যে উদ্‌বুদ্ধ হইবেন না ?

না, ভগবানকে মনে করাইয়া দিতে হয় না। সকলের অন্তরে তিনি বিরাজমান। তাঁর সম্মতি বিনা কিছুই ঘটে না। প্রার্থনা মানে হৃদয়-অনুসন্ধান। তাঁর সহায়তা বিনা আমরা যে অসহায় প্রার্থনায় এ কথাই আমরা স্মরণ করিয়া লই। প্রার্থনা—ভগবানের কৃপা বিনা মানুষের প্রাণপণ চেষ্টাও যে নিষ্ফল এই জ্ঞান—ছাড়া কোন চেষ্টাই পূর্ণ নয়। প্রার্থনা নম্র হইতে বলে, আত্মশুদ্ধি ও আত্মানুসন্ধান করিতে বলে।

[হরিজন, ৮-৬-৩৫]

যে শক্তি সকল শক্তি অপেক্ষা অধিক বলবান সেই অদৃশ্য শক্তিকে মানুষ সংজ্ঞায় অভিহিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে আর

আমার বিশ্বাস, সেই চেষ্টা হইতে রাম, রহমান, অহুর মজ্‌দ, গড্‌ বা কৃষ্ণ ইত্যাদি অভিধার সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষ অপূর্ণ কিন্তু পূর্ণ হওয়ার নিরন্তর চেষ্টা সে করে, ইহা তাহার স্বভাবধর্ম। এই প্রচেষ্টার অনুষঙ্গে নানা স্বপ্ন সে রচনা করে। আর শিশু যেমন দাঁড়াইবার চেষ্টায় বারবার আছাড় খায় আর শেষটায় হাঁটিতে শেখে মানুষও তেমন তাহার সকল বুদ্ধি সত্ত্বে অনন্ত ও অকাল ভগবানের তুলনায় শিশুমাত্র। অতিরঞ্জন মনে হইলেও ইহা অতিরঞ্জন নয়। ভগবানের বর্ণনা মানুষ তাহার পঙ্গু ভাষায়ই না করে! যে শক্তিকে আমরা ভগবান বলি তাহা বর্ণনাতীত। মানুষ তাঁর বর্ণনা করুক সেই দরকারও তাঁর নাই। যে শক্তি বিশাল সমুদ্র হইতেও বিশাল তাঁর বর্ণনার কোন বাহন দরকার মানুষের। এ কথা ঠিক হয় তো প্রার্থনা কেন করিব সে প্রশ্ন ওঠে না। মানুষ ভগবানের ধারণা তাহার মনের পরিধি অনুযায়ীই না করিবে! ভগবান সমুদ্রের মত বিশাল, অসীম। আর মানুষ জলবিন্দুর মত ক্ষুদ্র। বিন্দু সিন্ধুর কল্পনা করিবে কি করিয়া? সমুদ্রে গিয়া মিশিলে, তাহাতে বিলীন হইলেই না বিন্দু অনুভব করিবে সমুদ্র কি? এই অনুভব কথায় ব্যক্ত করা যায় না। ব্ল্যাবাট্‌স্কীর কথায় বলিলে, প্রার্থনাকালে মানুষ নিজ মহান্‌ আত্মারই উপাসনা করে। ভগবান অন্তরে বিরাজমান এই প্রত্যয় যাহার আছে সে-ই কেবল ঠিক প্রার্থনা করিতে পারে। যাহার নাই তাহার প্রার্থনা করার দরকার নাই। ভগবান তাহাতে অসন্তুষ্ট হইবেন না। কিন্তু অভিজ্ঞতা হইতে বলিব যে, যে প্রার্থনা করে না সে ঠকে। অতএব কেহ স্থূল দেহরূপেই তাঁর পূজা করুক বা কেহ সূক্ষ্ম শক্তিরূপে—তাহাতে কিছু আসে যায় না। নিজ নিজ দৃষ্টি অনুসারে উভয়েই ঠিক করে। প্রার্থনার কোন্‌টি যে পূর্ণ ঠিক পথ তাহা কেহ জানে না আর কোন দিন জানিবেও না। আদর্শ চিরকাল আদর্শই থাকিবে। ভগবান সকল শক্তির মূল শক্তি এ

কথা মনে রাখিলেই হইল। অন্য সব শক্তি ভৌতিক। কিন্তু একমাত্র ভগবানই প্রাণাধার বা সূক্ষ্ম-সত্তা। তাহা সর্বব্যাপী ও সর্বধারক আর তাই মানববুদ্ধির অগোচর।

[হরিজন, ১৮-৮-৪৬]

জনৈক বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর সহিত কথাবার্তা

বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ডঃ ফেব্‌রি এবটাবাদে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন ও জানিতে চান ঃ

"প্রার্থনায় কি ভগবানের অভিপ্রায়ের পরিবর্তন ঘটে? প্রার্থনা দ্বারা কি তা বোঝা যায়?"

গান্ধীজী—প্রার্থনার সময় আমি যে কি করি তা পরিষ্কার বোঝানো শক্ত। তা হলেও আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করছি। ভাগবত মানসের পরিবর্তন ঘটে না কিন্তু ওই দেবত্ব চেতন অচেতন সব কিছুতেই বর্তমান। অন্তরের সেই সুপ্ত দেবত্বকে আমি জাগ্রত করতে চাই। এইটেই প্রার্থনার মর্ম। ভাল, এমন তো হতে পারে যে, বুদ্ধি দিয়ে জিনিসটা বুঝি কিন্তু হৃদয়ের পরশ তাতে নেই। অতএব আমি যখন স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করি তখন আমি স্বাধীনতা প্রাপ্তির তথা স্বরাজ অর্জনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করার শক্তি যাচ্ঞা বা কামনা করি। আমি বিশ্বাস করি প্রার্থনা হতে তা লাভ করা যায়।

ডঃ ফেব্‌রি—তবে তো একে প্রার্থনা বলা আপনার সঙ্গত হবে না। প্রার্থনা মানে কৃপা ভিক্ষা বা দাবি করা।

গান্ধীজী—হাঁ, তাই। বলতে পারেন যে আমি নিজের কাছে, প্রগত আত্মসত্তার কাছে, প্রকৃত আত্মসত্তার কাছে, যাতে আজও একেবারে মিলিয়ে যেতে পারি নি, যাচ্ঞা করি। অতএব একে আপনি সর্বব্যাপক দেবত্বে বিলীন হওয়ার ব্যাকুল আকূতি বলতে পারেন।

ডঃ ফেব্রি—যাঁরা প্রার্থনা করতে পারেন না তাঁদের কি হবে ?

গান্ধীজী—নম্র হ'ন, এ কথা তাঁদের আমি বলব। আপনাদের ধারণার বুদ্ধকে দিয়ে প্রকৃত বুদ্ধকে খণ্ডিত করবেন না। বুদ্ধদেব লাখো-লাখো লোককে প্রভাবিত করেছেন আর আজও করছেন। প্রার্থনা করার মত নম্রতা যদি তাঁর না থাকত তবে এ সম্ভব হত না। বুদ্ধি থেকে অনেক গুণ শ্রেষ্ঠ কিছু আছে যা আমাদের চালায় আর নাস্তিকদেরও। সংকটকালে নাস্তিকতায় তাদের কুলোয় না, দর্শন বা তত্ত্ববিদ্যায়ও না। আরও ভাল কিছু, নিজের মধ্যে নাই বাইরেকার এমন কিছু, তাদের আশ্রয় না করলে চলে না। আর তাই কেউ আমাকে প্যাঁচালো প্রশ্ন করে তো আমি বলি, 'শূন্য না হলে ভগবান কি, প্রার্থনা কি তা বুঝবেন না। আপনি খুব বড় হতে পারেন, অশেষ মেধাবী হতে পারেন, তা সত্ত্বেও এই বিশ্বে যে আপনি অণু-প্রমাণমাত্র, এই নম্রতা আপনার থাকা চাই। জীবনপ্রশ্নে কেবল বুদ্ধির উৎকর্ষ পর্যাপ্ত নয়। একমাত্র বুদ্ধির অতীত আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হতেই সন্তোষ লাভ হতে পারে। ধনী লোকদের জীবনেও সংকট-মুহূর্ত আসে। পয়সায় লভ্য ও স্নেহের দেয় সব কিছু সুলভ হলেও তাদের জীবনে এমন সময় আসে যখন তারা একান্ত অসহায় বোধ করে। সে সময়ে যাঁর ইঙ্গিতে আমাদের প্রতি পদক্ষেপ পড়ে তাঁর চকিত দর্শন মেলে, ছায়া চোখের সামনে ভাসে।

ডঃ ফেব্রি—বৌদ্ধিক ভাবনা হতে যা অধিক বলবান, একে সেই ধার্মিক অনুভব বলা যেতে পারে। জীবনে দুইবার সেই অনুভব আমার হয়েছে। তার পরে আর হয় নি। কিন্তু এখন আমি বুদ্ধদেবের এই দুই বাণী—(১) 'স্বার্থপরতা দুঃখের কারণ,' (২) 'ভিক্ষুগণ, মনে রেখো, সব কিছু ক্ষণস্থায়ী'—হতে অশেষ সান্ত্বনা লাভ করি। এই দুইয়ের চিন্তন প্রায় ঈশ্বরবিশ্বাসেরই তুল্য।

"এরই নাম প্রার্থনা," গান্ধীজী কথাটা এত জোর দিয়া বলিলেন যে হৃদয়ে ছাপ না পড়িয়া যায় না।

[হরিজন, ১৯-৮-৩৯]

১৪

প্রার্থনা—কিভাবে, কাহার কাছে ও কখন ?

'নবজীবন'-এর কোন পাঠক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"প্রায়ই আমাদিগকে আপনি ভগবানের আরাধনা করতে, প্রার্থনা করতে বলেন। কিন্তু কিভাবে ও কার কাছে করতে হবে তা কখনও বলেন নাই। অনুগ্রহ করে এর আলোচনা করবেন কি ?"

ভগবানের উপাসনা মানে তাঁর নামকীর্তন। নিজের তুচ্ছতার, দুর্বলতার কথা স্বীকার করার নাম প্রার্থনা। ভগবানের সহস্র নাম বা তিনি অনামা। যাহার যে নামে রুচি সে সেই নামে তাঁর আরাধনা করিতে পারে। কেহ বলে রাম, কেহ কৃষ্ণ, অন্য কেহ বা রহিম অথবা গড্। একই পরমাত্মার পূজা সকলেই করে। কিন্তু সব খাদ্য যেমন সকলের সয় না, তেমন সকল নাম সকলের রোচে না। প্রতিবেশ-পরিবেশ ও অনুষঙ্গ অনুসারে লোকে নাম নির্বাচন করে। আর অন্তর্যামী সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ বলিয়া আমাদের নিভৃততম ভাবনার কথা তিনি জানেন এবং যাহার যেমন প্রাপ্য তদনুসারে সাড়া দেন।

অতএব আরাধনা বা প্রার্থনা মুখের কথায় নহে, হৃদয়ের ভাষা দিয়া করা চাই। আর তাই বোবা-তোতলা, অজ্ঞানী-অবোধ সকলেই প্রার্থনা করিতে পারে। যাহাদের কথা মধুমাখা কিন্তু হৃদয় বিষে ভরা তাহাদের কথায় ভগবান কান দেন না। সুতরাং প্রার্থনা করিবে তো শুদ্ধ হৃদয়ে করা চাই। রাম কেবল হনুমানের মুখেই ছিলেন তাহা

নহে, তাহার হৃদয়-মন্দিরেও ছিলেন। হনুমানকে তিনি অফুরন্ত শক্তি দিয়াছিলেন। তাঁর শক্তিতে শক্তিমান হনুমান পর্বত উত্তোলন করিয়াছিলেন, সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। বিশ্বাসে বিক্ষুব্ধ সাগর পার হওয়া যায়, পর্বত টলানো যায়, মহাসমুদ্র লঙ্ঘন করা যায়। ভগবান অন্তরে বিরাজমান এই সদাজাগ্রত জ্বলন্ত চেতনার নাম বিশ্বাস। এই প্রত্যয় যাহার জন্মিয়াছে সে সব কিছু পাইয়াছে। দেহে সে রুগ্ন হইতে পারে কিন্তু আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যে সে সম্পন্ন; পার্থিব সম্পদে সে গরীব কিন্তু আধ্যাত্মিক সম্পদে মহাধনী।

কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে, 'এতটা চিত্তশুদ্ধি লাভের উপায়?' মুখের ভাষা শেখানো সহজ কিন্তু হৃদয়ের ভাষা শেখাবে কে? একমাত্র ভক্ত তাহা পারে কারণ সে তাহা জানে। গীতা তিন জায়গায় ভক্তের বর্ণনা করিয়াছে; সাধারণভাবে ভক্তের উল্লেখ তো গোটা বইয়েই আছে। কিন্তু ভক্তলক্ষণের জ্ঞানে পথের পূর্ণ সন্ধান মিলিবার নয়। ভক্ত জগতে অতীব বিরল। তাই তো উপায় হিসাবে সেবা-ধর্ম আমি সামনে ধরিয়াছি। যে লোক মানুষের সেবা করে ভগবান নিজ গরজে তাহার হৃদয়ে আসন পাতেন। তাই না নরসি মেহতা যিনি দেখিয়াছিলেন উপলব্ধি করিয়াছিলেন, বলিয়াছেন, 'বৈষ্ণবজন তো তেনে কহিয়ে, জে পীড় পরাই জাণে রে।' ঠিক এরূপই ছিলেন আবু বেন আদম। মানবসেবা তিনি করিয়াছিলেন, তাই ভক্ত-তালিকার শিরোভাগে তাঁহার নামের উল্লেখ ছিল।

কিন্তু নিপীড়িত কারা, বিপন্ন কারা? দলিত যারা, অন্নহীন যারা। অতএব ভক্ত হইতে হইলে দেহ, মন, আত্মা দিয়া সেবা করিতে হইবে। দলিতদের যে লোক অস্পৃশ্য মনে করে, দেহ দ্বারা সে তাহাদের সেবা তবে কিরূপে করিবে? গরীবদের মুখের দিকে তাকাইয়া যাহারা সুতা কাটার মত কষ্টটুকু করিতে নারাজ ও বাহানা দিয়া এই দায় এড়ায়, সেবা যে কি তাহা তাহারা জানে না। সুস্থ-সবল

লোককে ভিক্ষা দিতে নাই। সে বেহায়া। কিন্তু কেহ যদি কর্মের বিনিময়ে অন্ন চায় তো তাহা তাহার দাবি, অধিকার। ভিক্ষায় লোক আত্মসম্মান খোয়ায়। যে গরীবদের কাছে গিয়া সুতা কাটে ও তাহাদের কাটিতে বলে সে ভগবানের প্রকৃষ্ট সেবা করে। ভগবদ্‌গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—"যে লোক আমাকে ভক্তিভরে তুচ্ছ 'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ম্‌' দেয় সে আমার সেবক।" 'যে লোক নম্র, দীনাতিদীন, পরিত্যক্ত' তাহার হৃদয়ে তাঁর অধিষ্ঠান। অতএব এরূপ লোকের জন্য সুতা কাটা অপেক্ষা উত্তমতর প্রার্থনা, আরাধনা, ত্যাগ আর কিছু হইতে পারে না।

তাই প্রার্থনা যে কোন নামে করা যায়। ভক্তিময় হৃদয় প্রার্থনার বাহন আর হৃদয় ভক্তিময় হয় সেবায়। হিন্দুরা যদি হৃদয় ঢালিয়া অস্পৃশ্যদের সেবা করে তো ঠিক প্রার্থনা করিবে। এ যুগের তাহাই যথার্থ প্রার্থনা। গরীব অন্নহীন লোকের জন্য যে সকল হিন্দু ও অহিন্দু প্রার্থনা-ভাব হইতে সুতা কাটে, তারা সত্য সত্যই প্রার্থনা করে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৪-৯-২৫]

এই সব ভক্তিময় কর্মে কত সময় দিতে হইবে তাহার কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই। তাহা নির্ভর করে ব্যক্তির প্রবৃত্তি ও প্রকৃতির উপর। মানুষের দৈনিক জীবনের এসব অমূল্য মুহূর্ত। আমরা যাহাতে ধীর-স্থির ও বিনয়-নম্র হই এবং তাঁর ইচ্ছা বিনা কিছু ঘটে না ও আমরা ওই পরম কুম্ভকারের হাতে মাটির তালমাত্র—এই বোধ যাহাতে জাগে তার জন্যই এই সব অভ্যাস-অনুশীলনের বিধান। এই সব মুহূর্তে লোকে খানিক আগে কি করিয়াছে তাহা ভাবে, নিজ দুর্বলতা স্বীকার করে, ক্ষমা ভিক্ষা করে এবং ভাল হওয়ার ও ভাল করার শক্তি যাচ্ঞা করে। কাহারও কাছে দুই-চার পলই পর্যাপ্ত

আর কাহারও পক্ষে চারিপ্রহর অপর্যাপ্ত। যাহাদের জীবন ঈশ্বরময়, কর্মই তাহাদের কাছে প্রার্থনা। গোটা জীবনটাই তাহাদের অখণ্ড প্রার্থনা বা নিরন্তর উপাসনা। আর যাহারা পাপকর্মে, বিষয়-ভোগে ও স্বার্থকর্মে রত তাহাদের পক্ষে কোন সময়ই বেশী নহে। সেই ধৈর্য, সেই বিশ্বাস, সাত্ত্বিক-শুদ্ধ হওয়ার সেই আকূতি থাকে তো ভগবানের পাবক সান্নিধ্যের স্পষ্ট অনুভূতি না হওয়া পর্যন্ত তাহারা প্রার্থনা করিবে। এই দুই অন্তিমের মাঝামাঝি কোন পথ না হইলে সাধারণ মানুষ আমাদের চলে না। যাহা কিছু করি সমর্পণবুদ্ধি হইতে করি এ কথা বলার মত আমরা মহৎও নহি, আবার নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছু জানি না এরূপ অধমও সম্ভবত নহি। তাই সকল ধর্মই সাধারণ আরাধনার জন্য কতকগুলি সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। দুঃখের বিষয়, কপটাচার না হইলেও এসব নেহাত যান্ত্রিক ও গতানুগতিক হইয়া গিয়াছে। শুদ্ধ মনোভাব হইতে এই সব পূজা-আরাধনা করা চাই।

প্রার্থনা যদি নেহাত ব্যক্তিগত হয় অর্থাৎ প্রার্থনাকারীর ভগবানের কাছে যদি কিছু যাচ্ঞা করার থাকে তো নিজ কথায় অবশ্য তাহার প্রার্থনা করা উচিত। জীবমাত্রের প্রতি ন্যায় ব্যবহার করার শক্তি যাচ্ঞা করা অপেক্ষা দিব্য প্রার্থনা আর কিছু হইতে পারে না।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১০-৬-২৬]

১৫

উপবাস

প্রকৃত উপবাসে দেহ মন ও আত্মা শুদ্ধ হয়। উপবাসে কামবৃত্তি দগ্ধ হয় আর সেই অনুপাতেই আত্মা বন্ধনমুক্ত হয়। ঐকান্তিক প্রার্থনায় অঘটন ঘটে। উপবাস মানে আত্মার আরও বেশী শুদ্ধ-পবিত্র হওয়ার আকুল আকূতি। এভাবে লব্ধ পবিত্রতা যখন মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত নিয়োজিত হয় তখন তাহা প্রার্থনা হইয়া যায়। প্রার্থনা যে কোথায় আসিয়া ঠেকিয়াছে তাহা বুঝা যাইবে এ কথা হইতে যে, পার্থিব ব্যাপারের জন্য, রোগ নিরাময়ের জন্য গায়ত্রী মন্ত্র জপ করা হয়। দেশের দুর্দিনে, আপৎকালে নম্রহৃদয়ে একাগ্রচিত্তে বুদ্ধিপূর্বক জপ করিলে এই গায়ত্রী মন্ত্রই বিপদ-নিবারণের পক্ষে আমাদের মস্ত বড় সহায় হইতে পারে। গায়ত্রী-জপ, নামাজ-পড়া ও খ্রীষ্টীয় প্রার্থনা এ সব অবোধ ও সহজ-বিশ্বাসী লোকদেরই সাজে, এরূপ মনে করা ভুল। ইহা অপেক্ষা বড় ভুল আর কিছু হইতে পারে না। উপবাস ও প্রার্থনা আত্মশুদ্ধির উত্তম ফলদায়ক উপায়। আর যাহা শুদ্ধ করে তাহা স্বভাবতই আমাদিগকে অধিকতর কর্তব্যনিষ্ঠ হইতে ও ইষ্ট লাভ করিতে সহায়তা করে। কখনও কখনও মনে হইবে উপবাস ও প্রার্থনা বুঝি ব্যর্থ হইল। তখন বুঝিতে হইবে উপবাস ও প্রার্থনা যেভাবে করিতে হয় সেভাবে করা হয় নাই।

যে লোক উপবাস করে কিন্তু সারাদিন জুয়া খেলিয়া কাটায়,—যেমন জন্মাষ্টমীর দিনে অনেকে করে,—অধিক পবিত্রতারূপ ফল লাভ করা দূরে থাকুক, উল্টা এরূপ উচ্ছৃঙ্খল উপবাসের ফলে তাহার অবনতি ঘটে। যে উপবাসে মনে স্বতঃই পবিত্রভাব জন্মে ও অপবিত্র ভাব দূর করার সংকল্প দৃঢ় হয় তাহাই প্রকৃত উপবাস। প্রকৃত

প্রার্থনা সম্বন্ধেও ওই কথা : প্রার্থনা সরল সহজ সুস্পষ্ট হওয়া চাই। তাহাতে তন্ময় হইয়া যাওয়া চাই। এদিকে জপমালা ফিরাই ও আল্লার নাম করি আর ওদিকে মন বিষয়ের আনাচে-কানাচে ঘুরিয়া বেড়ায় তো সে প্রার্থনা কেবল ব্যর্থই নয়, হানিকর।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৪-৩-২০]

উপবাস চাপমূলক হইতে পারে এ কথা মানি। স্বার্থসিদ্ধির জন্য অবলম্বিত উপবাস তাহাই। কারো কাছ হইতে টাকা আদায়ের জন্য বা তদ্রূপ অন্য কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য অবলম্বিত অনশন চাপ-প্রয়োগের বা অন্যায় প্রভাব পরিচালনারই শামিল। এরূপ অন্যায় চাপ প্রয়োগের আশ্রয় কেহ নেয় তো উহার বিরোধ করা কর্তব্য। আমার বিরুদ্ধে লোকে যে সব অনশন করিয়াছে বা করিবে বলিয়া ভয় দেখাইয়াছে, সাফল্যের সহিত আমি সে সবের বিরোধ করিয়াছি। কোন্ অনশন স্বার্থসিদ্ধির জন্য আর কোন্‌টি নয় তাহা বলা কঠিন এ কথা বলেন তো বলিব, যে অনশন স্বার্থসিদ্ধিমূলক বা হীন-উদ্দেশ্য-মূলক মনে হইবে তাহার প্রশ্রয় মোটেই দিবেন না। তাহাতে যদি অনশনকারীর মৃত্যু ঘটে ঘটুক। এরূপ বাধাদান যদি নিয়ম হইয়া যায় তবে হীন-উদ্দেশ্যমূলক বা জবরদস্তিমূলক অনশনের মূলে ছাই পড়িবে। মানুষের অন্য সব রীতি-রেওয়াজের মত অনশনেরও অপব্যবহার হইতে পারে। অপব্যবহার হইবে ভয়ে সত্যাগ্রহের তূণের এই দিব্য শরের ব্যবহার বন্ধ করা চলে না। সত্যাগ্রহ হিংসার ফলপ্রদ বিকল্প। এর প্রয়োগ সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে অতএব ইহা ত্রুটিরহিত নহে। সত্যাগ্রহের নব-প্রয়োগের প্রবর্তক আমিই যদি উহার বিবিধ প্রয়োগের পরীক্ষায় বিরত হই তবে এই দীন গবেষকের গবেষণা করার দাবি ভাসিয়া যাইবে।

[হরিজন, ৯-৯-৩৩]

খ্রীষ্টানদের আপত্তি

[আমরণ অনশনের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের খ্রীষ্টানদের নীতিগত বিরূপ মনোভাবের কথা জানাইয়া সি. এফ. এণ্ড্রুজ গান্ধীজীকে এক পত্র লিখেন। উহার উত্তরে গান্ধীজী লিখেন—]

হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের যেখানে-সেখানে উপবাসের উল্লেখ দেখা যায় এবং আজও যে কোন অছিলায় হাজারো হিন্দু উপবাস করে। ইহা এমন বস্তু যাহাতে প্রায় কোন ক্ষতিই হয় না। ভাল যে কোন জিনিসের মত ইহারও অপব্যবহার হয় সন্দেহ নাই। তাহা অনিবার্য। ভালোর ভেকে লোকে কখন-সখন মন্দ করে বলিয়া ভাল করিব না, তাহা তো ঠিক নয়।

আমার প্রোটেস্টাণ্ট খ্রীষ্টান বন্ধুদের লইয়াই আমার যত মুশকিল ; তাঁহাদের সংখ্যা অনেক আর তাঁহাদের বন্ধুত্ব আমার কাছে অমূল্য। তাঁহাদের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রপাত হইতেই জানি যে উপবাস সম্বন্ধে তাঁহারা বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন ; কেন যে করেন তাহা আজও আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই, এ কথা স্বীকার করিতে আমার সংকোচ নাই।

আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য দেহকে তপে ক্লিষ্ট করিতে হয়, সারা দুনিয়া এ কথা মানিয়া আসিয়াছে। উপবাস ছাড়া প্রার্থনা হয় না—প্রার্থনা কথাটি ব্যাপকতম অর্থে এখানে ব্যবহৃত হইতেছে। পূর্ণ উপবাস মানে অহং-এর পূর্ণ আহুতি। তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট প্রার্থনা। 'জীবন সঁপে দিনু তোরে, লাগুক তা সদা তোর কাজে'—এ মুখের কথা নয়, অলঙ্কারও নয় আর হওয়াও উচিত নয়। তাহা হওয়া চাই দিয়া ফতুর হওয়ার পরোয়াহীন ভরপুর আনন্দ। অন্নজল ত্যাগ, সে তো কেবল আরম্ভ, সমর্পণের নেহাত তুচ্ছ বহিরঙ্গ।

এই নিবন্ধের বিষয়ক্রম ভাবিয়া লইতেছি এমন সময় হাতে আসিল খ্রীষ্টানদের লিখিত এক পুস্তিকা। উহার এক অধ্যায়ে

উপদেশ অপেক্ষা যে আচরণ শ্রেষ্ঠ সে কথা বলা হইয়াছে। জোনাহ্‌র তৃতীয় অধ্যায় হইতে উহাতে একটি উদ্ধৃতি আছে। প্রবর্তা ভবিষ্যদ্‌বাণী করেন যে তাঁর প্রবেশের চল্লিশ দিনের দিন মহানগরী নিনেভ্‌ ধ্বংস হইবে :

"ভগবানের কথার সত্যতা সম্বন্ধে নিনেভের অধিবাসীদের কোন সংশয় ছিল না ; অনশন করার সংকল্প তারা ঘোষণা করল। আমীর-গরীব সকলে অনুতাপের বেশ ধারণ করল। রাজার কানে কথাটা পৌছল। সিংহাসন থেকে তিনি উঠলেন। রাজবেশ ত্যাগ করে অনুতাপের বেশ ধারণ করলেন। আর রাজা ও সামন্তদের নামে এই আদেশ নিনেভে জারি হল—'মনুষ্য-পশু, গরু-ভেড়া কিছু স্পর্শ করবে না—না খাদ্য, না জল। মনুষ্য-পশু সকলে অনুশোচনার বেশ ধারণ করবে এবং ভগবানের কাছে এই বলে আকুল আবেদন জানাবে—কুপথ ছেড়ে সকলে সুপথ ধরুক। অন্তরের হিংসা ধুয়ে ফেলুক। কে বলতে পারে যে ভগবান অনুশোচনা করবেন না, ভীষণ রোষ হতে নিবৃত্ত হবেন না, বিনাশ থেকে আমরা রক্ষা পাব না।' ভগবান তাদের ক্রিয়া লক্ষ্য করলেন, দেখলেন তারা অন্যায় পথ ত্যাগ করেছে। অভিশাপ দিয়েছেন বলে দুঃখিত হলেন ও অভিশাপ প্রত্যাহার করলেন।"

দেখিতে পাইতেছেন যে উহা ছিল 'আমরণ অনশনের' সংকল্প। কিন্তু আমরণ উপবাস মাত্রই আত্মহত্যা নয়। রক্ষাকল্পে নিনেভের রাজা ও অধিবাসীদের ওই-যে অনশন, তাহা ছিল ভগবত চরণে মহান্‌ নম্র প্রার্থনা। রক্ষা নয় তো বিনাশ এই ছিল উহার স্বরূপ। বাইবেল-উক্ত অনশনের সহিত তুলনা করা যদি ধৃষ্টতা না হয় তবে বলিব যে আমার অনশনের স্বরূপ ছিল ঠিক ওই। জোনাহ্‌র এই অধ্যায় পড়িতে পড়িতে মনে হয় রামায়ণেরই কাহিনী পড়িতেছি।

[হরিজন, ১৫-৪-৩৩]

১৬

চির দ্বন্দ্ব

নানা পুরাতন অভ্যাসের উর্ধ্বে ওঠা, কু জয় করিয়া সু-এর পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করাই মানবজন্মের বিধিনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য। এই বিজয়ের পথে আগাইয়া না দেয় তো ধর্ম ধর্মই নয়। কিন্তু জীবনের এই প্রকৃষ্ট পৌরুষের কার্যে সাফল্য লাভের সুগম পথ নাই। নানা দোষ আমাদের আছে। উহার মধ্যে সম্ভবত কাপুরুষতা সর্বাপেক্ষা বড় দোষ এবং সম্ভবত সর্বাপেক্ষা বড় হিংসাও—সাধারণত লোকে যাহাকে হিংসা বলে সেই নরহত্যা ইত্যাদি হইতে তো বটেই। কারণ কাপুরুষতা জন্মে ঈশ্বরের অস্তিত্বে অনাস্থাহেতু ও ঈশ্বরীয় ঐশ্বর্যের অজ্ঞানতাহেতু···আন্তরিক প্রার্থনাই ভীরুতা ও অন্য সব কু-অভ্যাস জয় করার সুনিশ্চিত অব্যর্থ উপায়। এ কথা আমি নিজ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি। ভগবান অন্তরে বিরাজমান এই উপলব্ধি বিনা প্রার্থনার আগ্রহ জন্মে না।

এই প্রক্রিয়াকে খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্মে ঈশ্বর ও শয়তানের, জরথুস্ত্রীয় ধর্মে অহুর মজ্‌দ ও অহরিমানের এবং হিন্দু ধর্মে দৈবী শক্তির সহিত আসুরী শক্তির ঝগড়া বলা হইয়াছে। বাহিরের দ্বন্দ্ব ইহা নয়, ভিতরের দ্বন্দ্ব। আমরা আসুরী শক্তির পক্ষে কি দৈবী শক্তির পক্ষে যোগ দিব তাহা আমাদের বাছিয়া লইতে হইবে। ভগবানের প্রার্থনা মানে আসুরী শক্তির নায়কের হাত হইতে নিস্তার লাভের নিমিত্ত ভগবানের সহিত মানুষের পবিত্র মৈত্রী-বন্ধন। কিন্তু যান্ত্রিক আবৃত্তি প্রার্থনা নয়। অন্তরের আকূতি প্রতি কথায় কার্যে এমনকি চিন্তায় রূপ গ্রহণ করা চাই। মনে যদি কু-চিন্তা জাগে তো বুঝিতে হইবে, ভগবানের নাম তোতাপাখীর মত লওয়া হইয়াছে।

কু-কথা ও কু-কার্য সম্বন্ধেও ওই কথা। প্রকৃত প্রার্থনা লোককে এই দোষত্রয়ী হইতে কবচের মত রক্ষা করে। এরূপ শুদ্ধ আন্তরিক প্রার্থনা সব সময়ে প্রথম চেষ্টায় লভ্য নয়। লড়িতে না ·চাহিলেও আমাদের লড়িতে হইবে, বিশ্বাস না হইলেও বিশ্বাস করিতে হইবে, কেন না আমাদের একটা মাস যায় না তো একটা বছর যায়। অতএব প্রার্থনার সামর্থ্য অনুভব করিতে চাই তো অশেষ ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হইবে। অন্ধকারে ঘিরিবে, হতাশায় পাইবে, তাহা অপেক্ষা অধিক মন্দ ঘটিবে ঘটুক, তবু এসবের বিরুদ্ধে লড়িতে হইবে। কাপুরুষের মত হাল ছাড়িলে চলিবে না। সাধনা কখনও পরাভব স্বীকার করে না।

উদ্ভট কাহিনী ইহা নয়। কাল্পনিক চিত্র আমি আঁকিতেছি না, উপস্থিত. করিতেছি সংক্ষেপে সেই সব লোকের সাক্ষ্য যাঁহারা আধ্যাত্মিক বিকাশ-মার্গের সমস্ত সংকট প্রার্থনা দ্বারা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। এই সঙ্গে সবিনয়ে নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলি ঃ যত দিন যাইতেছে তত বেশী সুস্পষ্ট আমি দেখিতে পাইতেছি যে, বিশ্বাস ও প্রার্থনা—এ দুই আমার কাছে অভিন্ন—হইতে আমি কী না পাইয়াছি! ঘণ্টা কয়েক দিন কয়েক সপ্তাহ কয়েক-এর নয়, চল্লিশ বছরেরও অধিক কালের নিরবচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার কথা আমি বলিতেছি। অন্য সবের মত আমিও কতবার যে হতাশ হইয়াছি, অন্ধকারে ডুবিয়াছি, নিরাশা ও সতর্কতার ইঙ্গিতে ক্ষান্ত হই-হই হইয়াছি আর কতবারই না সূক্ষ্ম অহংকারের আক্রমণ হইয়াছে তবুও বলিতে পারি যে, অন্তে আমার বিশ্বাস (জানি তাহা আজও ক্ষীণ, যেমনটা চাই তেমন অসাধারণ নয়) জয়ী হইয়াছে, সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়াছে। মন যদি বিশ্বাসে ও হৃদয় যদি প্রার্থনায় কানায়-কানায় ভরিয়া যায় তবে ভগবানকে যাচাই করার কথা, তাঁর সঙ্গে চুক্তি করার কথা মনে ঠাঁইও পায় না…যতদিন না শূন্য হইতেছি

ততদিন কু-প্রবৃত্তি জয় করা যাইবে না। ভগবানে পূর্ণ আত্মসমর্পণ না করিলে যেই মুক্তির লাভে জীবন সার্থক হয় সেই প্রকৃত মুক্তি মেলে না। আর এরূপ আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ জীবমাত্রের সেবায় ব্রতী হয়। সেই সেবা হয় তাহার তৃপ্তির আধার ও স্ফূর্তির উৎস। সৃষ্টির নিত্য নব সেবার নিমিত্ত তখন সে নিত্য নব মানুষ।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২০-১২-২৮]

১৭

আত্মশুদ্ধি

প্রেম ও অহিংসার শক্তির তুলনা নাই। ইহাদের ক্রিয়ায় হৈ-হল্লা নাই, আড়ম্বর নাই, ঘোষ নাই, বিজ্ঞাপন নাই। প্রেম ও অহিংসার জন্য চাই আত্মপ্রত্যয় আর আত্মপ্রত্যয়ের জন্য আত্মশুদ্ধি। নির্মল-চরিত্র পবিত্র মানুষ লোকমনে বিশ্বাস সঞ্চার করে। তাহাদের সান্নিধ্যে পরিবেশ আপনা-আপনি শুদ্ধ হইয়া যায়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৬-৯-২৮]

আত্মশুদ্ধি ব্যতীত জীবমাত্রের সহিত এক হওয়া যায় না। আত্মশুদ্ধি ব্যতীত অহিংসা ধর্মের অনুসরণ স্বপ্নই থাকিয়া যাইবে। চিত্ত যাহার শুদ্ধ নয়, ঈশ্বরোপলব্ধি তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং আত্মশুদ্ধি বলিতে সর্ব-কর্ম-শুদ্ধি বুঝায়। শুচিতা বস্তুটি সবিশেষ সংক্রামক তাই কোন এক ব্যক্তির শুচিতায় পরিবেশ শুচি-শুদ্ধ হইয়া যায়।

[আত্মকথা (১৯৪৮), পৃঃ ৬১৫]

কিন্তু শুচিতার পথ দুর্গম, দুরারোহ। পূর্ণ নির্মল, পূর্ণ পবিত্র হইতে হইলে কায়মনোবাক্যে কাম-ক্রোধ-শূন্য হইতে হইবে, পরস্পর-

বিরোধী ভাব অনুরাগ ও বিতৃষ্ণা এবং রাগদ্বেষ জয় করিতে হইবে। অনুক্ষণ নিরবচ্ছিন্ন প্রযত্ন করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি এই ত্রিবিধ পবিত্রতা আমার লাভ হয় নাই, সে কথা আমি জানি। তাই দুনিয়ার প্রশংসায় আমি ভুলি না, উল্টা অনেক সময় তাহা হুলের মত বিঁধে। আমার মনে হয়, কাম-ক্রোধাদি সূক্ষ্ম বৈরী জয় করা অস্ত্রবলে স্থূল জগত জয় করা অপেক্ষা অনেক বেশী দুরূহ।

[আত্মকথা (১৯৪৮), পৃঃ ৬১৬]

মহৎ কর্মে কখনও পরাভব স্বীকার করিবে না। আজই সংকল্প কর যে তোমরা পবিত্র হইবে এবং ভগবান সাড়া না দেওয়া পর্যন্ত নিরস্ত হইবে না। কিন্তু দাম্ভিকের প্রার্থনায় তিনি সাড়া দেন না আর দেন না যাহারা তাঁর সঙ্গে দর-কষাকষি করে তাহাদের প্রার্থনায়। ......তাঁর সহায়তা যাচ্ঞা করিবে তো অকপট হৃদয়ে শিশুর মত তাঁর শরণ লও, ভয় করিও না বা তোমার মত পতিতকে তিনি সহায়তা করিবেন কি-না এই সংশয় মনে স্থান দিও না। লাখো শরণাগতকে যিনি বিমুখ করেন নাই, তিনি কি তোমায় বিমুখ করিবেন? ব্যতিক্রম তিনি মোটেই করেন না এবং তুমি দেখিতে পাইবে যে তোমার সকল প্রার্থনায় তিনি সাড়া দিবেন। যে লোক পাপীরও অধম তাহার প্রার্থনাতেও সাড়া দিবেন। এ কথা আমি নিজ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি—নরক ভোগ করিয়া আমি শুদ্ধ হইয়াছি। আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ কর, সব কিছু লাভ হইবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৪-৪-২৯]

মৌনের মহিমা

বহুবার আমার মনে হইয়াছে যে সত্যের সাধকের মৌন ধারণ করিতে হয়। মৌনের মহা আশ্চর্য প্রভাবের কথা আমি জানি। দক্ষিণ আফ্রিকায় ট্রেপিস্টদের* এক একান্ত নিবাসে আমি গিয়াছিলাম। স্থানটি মনোরম। নিবাসের অধিকাংশ অধিবাসী মৌনব্রতধারী ছিল। পুরোহিতকে (ফাদার) মৌনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "এর কারণ সুস্পষ্ট। আমরা দুর্বল মানুষ। কি যে বলি অনেক সময় তা আমরা জানি না। নিরন্তর কথা বলে চলি তো আমাদের বিবেকের মৃদু গুঞ্জন যা নিরন্তর ধ্বনিত হচ্ছে তা শোনা যাবে না।" ওই অমূল্য কথা আমার মনে রেখাপাত করিয়াছিল। মৌনের মহিমা আমি জানি।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৬-৮-২৫]

অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিয়াছি যে, সত্যের সাধকের পক্ষে মৌন আধ্যাত্মিক সংযমের এক অঙ্গ। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মনের কথা লুকানো, রং ফলিয়ে বলা বা ঘুরিয়ে বলার প্রবৃত্তি মানুষের আছে। ইহা তাহার স্বাভাবিক দুর্বলতা। মৌন তাহা হইতে বাঁচার পথ। যে লোক কম কথা কয় সে ক্বচিৎ বাজে কথা বলে। প্রতিটি কথা সে ওজন করিয়া বলে। কথা বলার জন্য পাগল লোকের অভাব নাই। সভার সভাপতি হইয়াছেন তো বক্তৃতা করার অনুমতি চাহিয়া শত গণ্ডা লোক আপনাকে উত্যক্ত করিবে। অনুমতি দেন তো বক্তা নির্দিষ্ট সময়ের অধিক বলিবে। আরও সময় চাহিবে এবং বিনা অনুমতিতে বলিয়া যাইবে—এটা সাধারণ

* মৌনাবলম্বী এক খৃষ্টীয় সাধু-সম্প্রদায়।—অনুবাদক

ব্যাপার। এরূপ বকবকানিতে দুনিয়ার প্রায় কোনই লাভ হয় না। যে সময়টা যায় বৃথাই যায়।

[আত্মকথা (১৯৪৮), পৃঃ ৮৪]

মৌনের কথা যখন ভাবি তখন স্বতঃই মনে হয়, বাদ-বিসংবাদী আমরা যদি মৌনের মহিমা বুঝিতাম তবে দুনিয়ার অর্ধেক দুঃখ দূর হইয়া যাইত। আধুনিক সভ্যতা আসার আগে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্তত ছয়-সাত ঘণ্টা মৌন থাকার সুযোগ লোকের মিলিত। বর্তমান সভ্যতা রাতকে দিন বানাইয়াছে আর দিব্য নীরবতাকে রূপান্তরিত করিয়াছে চিত্তবিক্ষেপকারী বিকট কোলাহলে। কর্মব্যস্ত জীবনে প্রতিদিন ঘণ্টা দুই যদি অন্তরে ডুবিতাম, মহান নীরবতার বাণী শোনার জন্য মনকে প্রস্তুত করিতাম তো কতই না ভাল হইত। দৈবী রেডিও অনুক্ষণ ধ্বনিত হইতেছে; শোনার মন থাকিলে শুনিতে পাইতাম। কিন্তু মৌন বিনা তাহা শোনা যায় না। রূপকের সাহায্যে মৌনের দিব্য পরিণামের মধুর চিত্র সেণ্ট টেরেসা এই কথায় আঁকিয়াছেন ঃ

"সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাবে ইন্দ্রিয়গ্রাম তোমার আজ্ঞাবহ হয়েছে, দৌড়াদৌড়ি ভুলে গেছে, কাজে ডুবে গেছে আর যাওয়ার নামটিও নেই, যেমন মৌমাছিরা চাকে ফিরে আসে, মধু তৈরীর কাজে লাগে আর চাক ছেড়ে যাওয়ার কথা ভুলে যায়। আর এসব ঘটবে তোমার বিনা চেষ্টায় সহজ অনায়াসে। ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ করেছ তো ভগবানের বরে ইন্দ্রিয়ের ওপর আত্মার এরূপ কর্তৃত্ব আসবে যে ইঙ্গিতমাত্র তোমার হুকুম তামিল করার জন্য তারা এক পায়ে খাড়া হয়ে যাবে। যাই ডাকবে অমনি আসবে। আর যতদিন যাবে তত তাড়াতাড়ি আসবে। আর শেষে বারংবার প্রযত্নের ফলে ভগবান

তাদের একেবারে নিবৃত্ত করে দেবেন, ধ্যানের পূর্ণাঙ্গ সাধন বানিয়ে দেবেন।"

[হরিজন, ২৪-৯-৩৮]

কি দৈহিক কি আধ্যাত্মিক কোন দিক হইতেই মৌন ছাড়া আমার চলে না। ইহার আরম্ভ হইয়াছিল কাজের চাপ হইতে কিছুটা বিরাম পাওয়ার জন্য। তা ছাড়া লেখার জন্য তখন আমায় সময় বাহির করিতে হইত। কিন্তু কিছু দিন অভ্যাস করার পরে ইহার আধ্যাত্মিক দিকে আমার নজর পড়ে। মৌনাবস্থা ভগবানে চিত্ত নিবিষ্ট করার প্রকৃষ্ট অবসর, চকিতের মত এই ভাবটা আমার মনে খেলিয়া গেল। আর এখন তো আমার মনে হয় যে আমার দেহ-মন যেন মৌনের জন্যই গড়া।

[হরিজন, ১০-১২-৩৮]

সত্যের সাধনায় আমার মত যাঁহারা রত মৌন তাঁহাদের অতি বড় অবলম্বন। আত্মা মৌনাবস্থায় পথের সুস্পষ্টতর সন্ধান পায় আর সমস্ত সংশয় ও কুহেলিকা দূর হইয়া যায়; দিব্য আলোর বিকাশ হয়। জীবন মানে সত্যানুসন্ধান—দীর্ঘ, কঠোর তপ এবং আভ্যন্তরীণ শান্তি ব্যতীত আত্মার জ্যোতি পূর্ণ প্রকট হয় না।

[হরিজন, ১০-১২-৩৮]

১৯

সব ধর্ম সমান

পথ ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু গন্তব্য সেই একই। সেই গন্তব্যে পৌঁছানো যায় তো হইলই বা পথ ভিন্ন ভিন্ন, ক্ষতি কি? বস্তুত যত লোক তত ধর্ম।

[হিন্দ্ স্বরাজ (১৯৪৬), পৃঃ ৩৬]

আমি বিশ্বাস করি যে পৃথিবীর সকল মহান্ ধর্মই অল্প-বিস্তর সত্য। 'অল্প-বিস্তর' কথাটি ব্যবহার করিতেছি তাহার কারণ অপূর্ণ মানুষের ক্রিয়া অপূর্ণ না হইয়া যায় না। পূর্ণতা একমাত্র ভগবানের বৈভব; তাহা অবর্ণনীয়, শব্দাতীত। আমি মনে করি, যে-কোন লোক পূর্ণ হইতে পারে, ভগবান যেমন পূর্ণ। পূর্ণতা লাভের চেষ্টা করা সকলেরই কর্তব্য। কিন্তু সেই দিব্য অবস্থা লাভ হইলে দেখা যায় যে কথায় তাহা বলা যায় না, সংজ্ঞায় তাহা ধরা যায় না। আর তাই আমি অতীব নম্রভাবে বলিব যে, বেদে কোরানে বাইবেলে উক্ত ঈশ্বরীয় বাণীও পূর্ণ নয়, এবং মানুষ আমরা অপূর্ণ বলিয়া ও নানা রিপু আমাদের লইয়া যদৃচ্ছ খেলা করে বলিয়া ভগবানের এই বাণীও পুরাপুরি বুঝিতে আমরা অক্ষম।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২২-৯-২৭]

ভগবান এক—এই বিশ্বাসের বনিয়াদে সকল ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। বস্তুত সর্ব জগতের ধর্ম কখনও এক হইবে এ কথা আমি মনে করি না। সৈদ্ধান্তিক দৃষ্টিতে বলা যায় যে ভগবান এক বলিয়া সব ধর্মও বস্তুত এক। কিন্তু কার্যত এমন দুই জন মানুষ আমি দেখি

নাই যাহাদের ভগবানের ধারণা ঠিক এক। অতএব সম্ভবত লোক-প্রকৃতির ও বাহ্য-প্রকৃতির আবশ্যকতা অনুযায়ী নানা ধর্ম চিরকাল থাকিবে।

[হরিজন, ২-২-৩৪]

এক ধর্ম আজিকার প্রয়োজন নয়, প্রয়োজন এক ধর্মের অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাভাব, উদারতা। বৈচিত্র্যহীন নিষ্প্রাণ ঐক্য কাম্য নয়, কাম্য বিবিধতায় ঐক্য মহান্। প্রচলিত রীতিনীতি, সংস্কার, জলবায়ু ও পরিবেশের প্রভাব মুছিয়া ফেলার চেষ্টা ব্যর্থ হইবেই, অধিকন্তু তাহা হইবে ধর্মের অপঘাত। সব ধর্মের আত্মা এক কিন্তু উহার বাহ্য প্রকাশ অসংখ্য আবরণে। বাহ্য ব্যবধান চিরকাল থাকিবে। জ্ঞানী ব্যক্তিরা বহিরাবরণ দেখেন না, দেখেন বিবিধ বহিরাবরণের অন্তরালে যে আত্মা তাহাকে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৫-৯-২৫]

হিন্দু ধর্মে যেমন যীশুর স্থান আছে তেমন আছে মহম্মদের, জরথুস্ত্র-র ও মুশার। আমার কাছে নানা ধর্ম একই ফুল-বাগানের নানা মনোহর ফুল বা একই মহীরুহের বিবিধ শাখা। অতএব সব ধর্মই সমান সত্য, যদিও মনুষ্য-মাধ্যমে প্রাপ্ত ও মনুষ্যের দ্বারা ব্যাখ্যাত বলিয়া তেমনই অসম্পূর্ণ। ভারতবর্ষে ও অন্য সকল দেশে যে ভাবে ধর্মান্তর করা হয় তাহা আমার কাছে একেবারে অসহ্য। এই পথ ভুল। আর এই ভুল শান্তির দিকে পৃথিবীর অগ্রগতির পথে সম্ভবত সর্বাপেক্ষা বড় অন্তরায়। "যুযুৎসু ধর্ম" বলিলে ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয়। অথচ যে ভারতকে বিশ্বধর্মের তথা নানা ধর্মের মাতা আমি মনে করি সেই ভারতের ইহাই যথাযথ বর্ণনা। সে যদি সত্যই মা তবে আজ তাহার পরীক্ষা চলিতেছে। খ্রীষ্টান হিন্দুকে আর হিন্দু খ্রীষ্টানকে কেন ধর্মান্তরিত করিতে চাহিবে? কোন লোক

যদি ভাল হয়, ঈশ্বরপরায়ণ হয় তো তাহাতেই হিন্দু বা খ্রীষ্টান খুশী হইবে না কেন? মানুষের নৈতিক চরিত্র বিচার্য না হইয়া বিচার্য যদি হয় গির্জা, মসজিদ বা মন্দিরের ধর্মানুষ্ঠান তো তাহা উপাসনার পরিহাসমাত্র। আর তাহা ব্যষ্টির বা সমষ্টির বিকাশেরও অন্তরায় হইতে পারে। আর এভাবে উপাসনা করা চাই বা এই মন্ত্র জপ করিতে হইবে বলার অর্থ হইবে ঝগড়া-বিবাদ, খুনাখুনি ডাকিয়া আনা। আর তাহার ফলে ভগবানে বিশ্বাস ভাসিয়া যাইবে, ভগবান ভাসিয়া যাইবে।

[হরিজন, ৩০-১-৩৭]

কিন্তু অন্য ধর্মশাস্ত্রের সমালোচনা বা ত্রুটি প্রদর্শন করা আমার কাজ নয়। সেই সবে যে সত্য দেখিতে পাইব তাহা লোকের কাছে ধরার ও জীবনে আচরণ করার সুযোগ হয় তো কৃতকৃতার্থ হইব। সুতরাং কোরানের বা পয়গম্বরের জীবনের যে কথা আমি বুঝি না তাহার সমালোচনা বা নিন্দা আমি নিশ্চয়ই করিব না। তাঁহার জীবনের যে সব বিষয় আমার ভাল লাগে ও বুঝি, সুযোগ পাইলেই সে সবের প্রতি আমি সানন্দে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। কোথাও খটকা লাগে তো তাহা আমি ভক্তিমান মুসলমানের দৃষ্টিতে দেখি ও সুবিখ্যাত মুসলমান টীকাকারদের ব্যাখ্যা দৃষ্টে বুঝিতে চেষ্টা করি। অন্য ধর্মের প্রতি এরূপ পূজ্যভাব পোষণ করিলেই কেবল সকল ধর্ম যে সমান সে কথা আমি উপলব্ধি করিতে পারিব। কিন্তু হিন্দুধর্ম শুদ্ধ হোক, শুদ্ধ থাকুক এই মনোভাব হইতে উহার সমালোচনা ও ত্রুটি প্রদর্শন করার অধিকার আমার আছে আর তাহা আমার কর্তব্যও বটে। কিন্তু অহিন্দু সমালোচকেরা যখন হিন্দুধর্মের সমালোচনায় ও ত্রুটি প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হয় তখন হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাহারা যে অজ্ঞ ও হিন্দুর দৃষ্টিতে হিন্দূধর্মকে দেখিতে

তাহারা যে অক্ষম সে কথা সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। তাহার ফলে তাহাদের দৃষ্টি হয় বক্র ও বিচার হয় দোষদুষ্ট। হিন্দুধর্মের অহিন্দু সমালোচকদের রোখ দেখিয়া আমি নিজের ক্রটি সম্বন্ধে সজাগ হইয়াছি ; তাহা আমায় বলে যে খ্রীষ্টানধর্মের বা ইসলামের তথা উহার প্রবর্তকদের সমালোচনা হঠকারিতা সহকারে করিতে নাই।

[হরিজন, ১৩-৩-৩৭]

ইসলামের আল্লা যিনি, খ্রীষ্টানদের গড্ বা হিন্দুদের ঈশ্বরও তিনি। হিন্দুধর্মে ভগবানের যেমন অনেক নাম, ইসলামেও তেমন তাঁর অনেক নাম। এ সব নাম ব্যক্তিবাচক নহে, গুণবাচক। ক্ষুদ্র মানুষ তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়া বর্ণনাতীত, অজ্ঞেয় ও অপরিমেয় মহৎ ভগবানের বর্ণনা বিবিধ গুণ আরোপ করিয়া করার চেষ্টা করিয়াছে। ভগবান আছেন এই বিশ্বাস মানে মানব-ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস। সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধার ভাবও ইহা হইতে সূচিত হয়।

[হরিজন, ১৪-৫-৩৮]

উদারতা

সহিষ্ণুতা কথাটা আমার ভাল লাগে না। কিন্তু ইহা অপেক্ষা ভাল কথাও জুটিতেছে না। সহিষ্ণুতা শব্দে দাক্ষিণ্যের—নিজ ধর্ম অপেক্ষা অন্য ধর্মকে অহেতুক হীন মনে করার—ভাব আছে। অথচ অহিংসার শিক্ষা এই যে, অন্য ধর্মের প্রতি নিজ ধর্মের মতই আদরভাব পোষণ কর, তাহার অর্থ তোমার ধর্মও যে পূর্ণ নয় সে কথা বোঝ ও স্বীকার কর। প্রেম-ধর্মের পূজারী সত্যের সাধক এ কথা সানন্দে মানিয়া লইবে। সত্যের সম্যক্ দর্শন লাভ হইলে কি আমরা সাধক থাকিতাম? ভগবানে লীন হইয়া যাইতাম, কারণ সত্যই ভগবান। কিন্তু সাধক বই নই বলিয়া সাধনা আমাদের চলিতেছে ও আমরা যে অপূর্ণ সেই বোধ আমাদের আছে। আর আমরা নিজেরাই যখন অপূর্ণ তখন আমাদের মন-প্রসূত ধর্মও অপূর্ণ। ধর্মের পূর্ণ অনুভব আমাদের হয় নাই, যেমন হয় নাই ভগবানের। ধর্ম আমাদের মন-প্রসূত আর তাই অপূর্ণ বলিয়া উহার বিকাশ ও নব নব ব্যাখ্যা চলিতে থাকিবে। সত্যের দিকে, ভগবানের দিকে অগ্রসর হওয়ার একটাই পথ আর তাহা হইতেছে ক্রমবিকাশের পথ। আর মানুষের পরিকল্পিত সকল ধর্মই যখন অপূর্ণ তখন আপেক্ষিক গুণভেদের প্রশ্নই ওঠে না। সত্যের প্রকাশ সব ধর্মেই হইয়াছে কিন্তু কোনটিই পূর্ণ নয়, ভ্রমের উর্ধ্বে নয়। অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার অর্থ উহার ত্রুটির প্রতি অন্ধ হওয়া নয়। নিজ ধর্মের ত্রুটি সম্বন্ধে সজাগ, সচেতন থাকা চাই; তাহা বলিয়া ধর্ম ত্যাগ করিতে নাই, উল্টা উহাকে ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করা চাই। সকল ধর্মকে সমান চক্ষে দেখিতে হইবে। আর যে ধর্মে

যাহা ভাল তাহা কেবল বিনা দ্বিধায়ই নয়, কর্তব্য বোধে গ্রহণ করিতে হইবে।

সে স্থলে প্রশ্ন উঠিবে—তবে এত শত ধর্ম কেন? আমরা জানি যে তাহাদের রূপভেদেরও অন্ত নাই। আত্মা এক কিন্তু যে দেহে তাহা প্রাণ সঞ্চার করে তাহা বহু। দেহ ভিন্ন ভিন্ন। সে ভেদ মিটানো আমাদের আয়ত্তের বাইরে। কিন্তু আত্মার একত্বে আমরা বিশ্বাস করি। বৃক্ষের কাণ্ড এক কিন্তু শাখা অনেক, পাতা অনেক; তেমনি ধর্ম এক, পন্থ বহু। পন্থমাত্রই ভগবানের দান কিন্তু মানুষের অপূর্ণতার ছোঁয়াচ তাহাতে লাগে, কেন না অপূর্ণ মানুষের মাধ্যমেই তাহাদের প্রকাশ। ভগবানের দেওয়া ধর্ম বাক্যাতীত। যে কথা জোটে সে কথায় অপূর্ণ মানুষ তাহা ধরে আর সে কথার ব্যাখ্যা তেমনই অপূর্ণ মানুষ করে। তবে কাহার ব্যাখ্যাকে শুদ্ধ ব্যাখ্যা বলা যাইবে? নিজ নিজ দৃষ্টি হইতে সকলেই তাহারা ঠিক আর সকলেই অঠিক এমনটাও হইতে পারে। তাই উদারতা দরকার। উদারতার অর্থ নিজ ধর্মের প্রতি ঔদাসীন্য নয়, পক্ষান্তরে উহার প্রতি সমধিক বিচারশুদ্ধ প্রেম। উদারতা হইতে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি লাভ হয়; আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ও ধর্মান্ধতার মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। প্রকৃত ধর্মজ্ঞানের উন্মেষ হইলে বিভিন্ন পন্থের ব্যবধান ঘুচিয়া যায় আর তাহার জায়গায় উদারতা দেখা দেয়। পরধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতার অনুশীলন করিলে নিজ ধর্মের জ্ঞান অধিকতর উজ্জ্বল হইবে।

সহিষ্ণুতা যে ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ বিচারের অন্তরায় নয় এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। মূলত একই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ও অতীতে ও বর্তমানে ধর্মপ্রাণ নরনারী কর্তৃক আচরিত পৃথিবীর বড় বড় ধর্মের কথাই এখানে আমি বলিয়াছি। ভাল-মন্দের প্রসঙ্গে এ কথাই বলিব যে দুরাচার ও পাপাচারের প্রতি অতি কঠোর ঘৃণা পোষণ করা সত্ত্বেও দুষ্কৃতাচারীকে সুকৃতাচারী ও পাপাচারীকে

পুণ্যাচারী মনে করার উদার বৃত্তি আমাদের অনুশীলন করিতে হইবে।
[ইয়ং ইণ্ডিয়া (বুলেটিন), ২-১০-৩০]

সকলে কখনও এক ভাবে ভাবিবে না ; তা ছাড়া সত্যকে লোকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ও ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিবে বলিয়া পারম্পরিক সহিষ্ণুতার ভাব অবলম্বন করাই সর্বোত্তম পথ। বিবেক সকলের সমান নয়। ব্যক্তির আচরণের পক্ষে বিবেক উত্তম পথপ্রদর্শক হইলেও কোন এক আচরণ-বিধি সকলের উপর চাপাইয়া দিলে তাহা হইবে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উপর অসহনীয় হস্তক্ষেপ।
[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৩-৯-২৬]

২১

ধর্মান্তর করা

[বৈদেশিক ধর্মযাজকদের সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে]

ধর্মান্তরকারী আপনারা এদেশে আসিয়া ভাবেন যে আপনারা ধর্মহীন ভগবানহীন পৌত্তলিকদের দেশে আসিয়াছেন। "সেখানকার সব কিছু অতি মনোরম। কেবল মানুষগুলি অমানুষ"—খ্রীষ্টান ধর্মবেত্তাদের অন্যতম প্রধান বিশপ হিবারের এই দুইটি বাক্য আমার অন্তরে কাঁটার মত বিঁধিয়াছে ও বিঁধে। এরূপ না লিখিলেই ভাল হইত। সারা ভারত আমি ঘুরিয়াছি ; আমার অভিজ্ঞতা ইহার বিপরীত। নিছক সত্যের সন্ধানে আমি দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে খোলা মনে ঘুরিয়াছি ; গঙ্গা-যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র বিধৌত এই অপরূপ দেশের কোথাও আমি অমানুষ দেখিতে পাই নাই। চরিত্রহীন সে নয়। সে আপনার ও আমার মতই সত্যের সাধক, বুঝি বা ততোধিক। এই প্রসঙ্গে একখানি ফরাসী বইয়ের কথা মনে পড়িতেছে—বইখানি কোন ফরাসী বন্ধু আমার জন্য অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। বইখানি জ্ঞানানুসন্ধানের

এক কাল্পনিক কাহিনী। অভিযাত্রীদের এক দল ভারতে আসে। এক পঞ্চমের* কুঁড়ে ঘরে তাহারা যায়; ভগবানের মূর্তরূপ তথায় তাহারা দেখিতে পায়। আপনাদের আমি বলি, এমন বহু অস্পৃশ্যের কুটির আছে যেখানে আপনারা ভগবানের নিশ্চিত দর্শন পাইবেন। বিচার করিতে তাহারা বসে না, ভগবান আছেন' এই বিশ্বাস তাহাদের অটল। ভগবানের সাহায্যের তাহারা ভিখারী আর তাহা তাহারা পায়ও। ভারতের সর্ব স্থানে এই মহৎ অস্পৃশ্যদের সম্বন্ধে বহু কাহিনী শোনা যায়। পতিত দুই-চার জন নাই তাহা নয়; তাহাদের মধ্যে নরোত্তমের নমুনাও আপনারা দেখিতে পাইবেন।

আমার অভিজ্ঞতা কি অস্পৃশ্যদের মধ্যেই নিবদ্ধ? তা নয়। মনুষ্যত্বের প্রকৃষ্ট নমুনা পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের মত এখানকার অ-ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণদের মধ্যেও আপনারা দেখিতে পাইবেন। ভারতে আজও এমন ত্যাগমূর্তি ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা দেবত্বের ও নম্রতার মূর্ত স্বরূপ। এমন ব্রাহ্মণও আছেন যাঁহারা অস্পৃশ্যদের কাছে কিছু প্রত্যাশা না করিয়া, প্রাচীনপন্থীদের ঘৃণা ও অভিশাপ উপেক্ষা করিয়া কায়মনোবাক্যে পঞ্চমদের সেবায় রত। এই ঘৃণা ও অভিশাপ তাঁহারা গায়ে মাখেন না, কারণ তাঁহারা অস্পৃশ্যদের সেবা করেন না তো করেন সাক্ষাৎ ভগবানের সেবা। প্রমাণ চান তো দিতে পারি। সেবা করার উদ্দেশ্যেই না আপনারা আসিয়াছেন। এ দেশকে ঠিক ঠিক বুঝিতে পারেন সুদ্ধ এই উদ্দেশ্যেই এসব কথা আপনাদের বলিলাম। আপনারা এখানকার দুঃখের খবর নিন, তাহা দূর করুন। কিন্তু আমি আশা করি, গ্রহণের মনোভাব হইতেই আপনারা আসিয়াছেন; আরও মনে করি যে আপনারা চক্ষু কর্ণ সর্বোপরি হৃদয় অর্গলবদ্ধ করিয়া রাখিবেন না, উল্টা চোখ কান ও হৃদয় মুক্ত রাখিয়া যাহা গ্রহণযোগ্য তাহা খুশী মনে গ্রহণ করিবেন। আমি আপনাদের

* দক্ষিণ ভারতের অস্পৃশ্য জাতি।—অনুবাদক

আশ্বাস দিয়া বলিতেছি যে ভারতে অনেক কিছু ভাল জিনিস আছে। সেন্ট জনের সেই সুবিখ্যাত স্তোত্র আবৃত্তি করিলাম আর হইয়া গেলাম খ্রীষ্টান এমন সহজ আত্মসন্তোষ যেন আপনারা না খোঁজেন। বাইবেল যদি ঠিক ঠিক পড়িয়া থাকি তো বলিব যে, এমন অনেক লোকের কথা জানি যাহারা যীশুর নাম শোনে নাই, খ্রীষ্ট-ধর্মের অনুমোদিত ব্যাখ্যা মানে না; যীশু যদি আজ মর্ত্যভূমে অবতীর্ণ হইতেন আমাদের অনেককে ফেলিয়া ভক্ত বলিয়া তাঁহাদের তিনি সাদরে গ্রহণ করিতেন। তাই আমি আপনাদের খোলা মনে নম্র হৃদয়ে সমস্যার সম্মুখীন হইতে বলি।

যে কথোপকথনের কথা দার্জিলিং-এর মিশনারী ল্যান্‌গুয়েজ স্কুলে উল্লেখ করিয়াছিলাম তাহার পুনরুল্লেখ এখানে না করিয়া পারিতেছি না। মিশনারীদের এক প্রতিনিধিদল চীনের সম্পর্কে লর্ড সেলিসবেরির সঙ্গে দেখা করে এবং তাঁহার কাছে নিরাপত্তার আশ্বাস চায়। লর্ড সেলিসবেরি উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে আমি বলিতে পারিতেছি না, তবে তাহার তাৎপর্য এই: "মহোদয়গণ, চীনে আপনারা যদি খ্রীষ্টের বাণী প্রচার করতে চান তো পার্থিব শক্তির মুখাপেক্ষী হবেন না; জীবন হাতে নিয়ে যান। চীনের লোকেরা যদি আপনাদের হত্যা করতে চায় তো বুঝবেন যে তাঁর কাজে আপনাদের দেহপাত হয়েছে।" লর্ড সেলিসবেরি ঠিক কথা বলিয়াছিলেন। খ্রীষ্টান মিশনারীরা ভারতে আসে রাজশক্তির ছায়াতলে, বলিব কি, পক্ষপুটে। তাহাতে দুর্লঙ্ঘ্য বাধাই সৃষ্টি হয়।

এত এত অনাথ বালক-বালিকাকে আপনারা রক্ষা করিয়াছেন, খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করিয়াছেন—এ কথা বলেন তো আপনাদের কথা আমি মানিয়া লইব। কিন্তু উহাই যে আপনাদের জীবন-কর্ম (মিশন) তাহা আমি মনে করি না। আমি মনে করি আপনাদের জীবনের

লক্ষ্য উহা অপেক্ষা অনন্তগুণ শ্রেষ্ঠ। ভারতে তো আপনারা মানুষই দেখিতে চান। তার জন্য আপনাদের গরীবদের কুটিরে যাইতে হইবে—দিতে আসিয়াছি এই মনোভাব হইতে নয়, পাই তো লইব এই মনোভাব হইতে। আমি ভারতের মিশনারীদের তথা ইউরোপীয়দের প্রকৃত বন্ধু, তাই যাহা আমি মর্মে মর্মে অনুভব করি আপনাদের বলিলাম। আপনাদের মধ্যে আমি গ্রহণের ইচ্ছা, নম্রতা ও ভারতের জনতার সহিত একরূপ হওয়ার আগ্রহ দেখিতে পাই না। আমি হৃদয় খুলিয়া বলিলাম। আপনারা হৃদয় দিয়া গ্রহণ করুন।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৬-৮-২৫]

আমি মনে করি, মানবসেবার অছিলায় ধর্মান্তরিত করা খুব কম বলি তো নীতিধর্মবিগর্হিত কর্ম। এখানকার লোকে ইহাকে নিঃসন্দেহ বিষ-দৃষ্টিতে দেখে। যাহাই বলুন, ধর্ম একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার, হৃদয়ের জিনিস। কোন খ্রীষ্টান ডাক্তার আমার রোগ নিরাময় করিয়াছে বলিয়া কেন আমি ধর্মান্তর গ্রহণ করিব অথবা সেই ডাক্তারই বা কেন তাহার প্রভাবাধীন লোকের কাছ হইতে এরূপ ধর্মান্তরের প্রত্যাশা করিবে বা ইঙ্গিত করিবে? চিকিৎসাতেই চিকিৎসার প্রতিদান ও সন্তোষ নয় কি? খ্রীষ্টানদের স্কুল বা কলেজে পড়ি বলিয়াই খ্রীষ্টীয় শিক্ষা আমার উপর চাপানো হইবে কেন? আমার বিশ্বাস ইহাতে লোকের উন্নতি ঘটে না, উল্টা মনে অব্যক্ত বৈরীভাব যদিবা না জন্মে, সন্দেহ তো জন্মেই। ধর্মান্তরিত করার রীতি-পদ্ধতি সর্বতোভাবে সন্দেহাতীত হওয়া চাই। ধর্মের দীক্ষা সাংসারিক বিষয়ের শিক্ষার মত দেওয়া চলে না। তাহা দিতে হয় অন্তরের ভাষা দিয়া। জ্বলন্ত আত্মবিশ্বাস থাকে তো তাহা গোলাপের সুবাসের মত আপনি ছড়াইয়া পড়ে। অদৃশ্য বলিয়াই উহার প্রভাব দৃশ্যমান গোলাপ-দল অপেক্ষা সমধিক মনোরম ও ব্যাপক।

তবেই দেখিতেছেন আমি ধর্মান্তরের বিরোধী নহি। আজকাল যে উপায় অবলম্বিত হয় তাহারই আমি বিরোধী। অন্যান্য বস্তুর ন্যায় ধর্মান্তর করাও আজ ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। ধর্মান্তর করার জন্য মাথা পিছু কত টাকা ব্যয় হইয়াছে ও পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য কত টাকা লাগিবে এরূপ এক মিশনারী রিপোর্ট আমার চক্ষে পড়িয়াছে।

হাঁ, ভারতে যে সকল মহৎ ধর্মমত আছে তাহাই ভারতের পক্ষে যথেষ্ট এ কথা আমি দৃঢ়ভাবে বলি। খ্রীষ্ট ও ইহুদি ধর্ম তো আছেই, তা বাদে হিন্দু ধর্ম ও উহার শাখা-প্রশাখা, ইসলাম ও জরথস্ত্র ধর্মমতও চলতি ধর্ম। কোন ধর্মমতই নিখুঁত নহে। যে মানুষ যে ধর্মের অনুগামী তাহার কাছে সে ধর্ম প্রিয়। অতএব পৃথিবীর বৃহৎ বৃহৎ ধর্মমতের অনুগামীদের কর্তব্য অন্য সব ধর্ম অপেক্ষা নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করার ব্যর্থ চেষ্টা না করিয়া পরস্পরের সহিত সখ্যসূত্রে মিলিয়া মিশিয়া থাকা। এরূপ সখ্য-সংযোগ হইতে আমাদের স্ব স্ব ধর্মের ত্রুটি ও আবর্জনা দূর করা সম্ভব হইবে।

উপরের মন্তব্য হইতে বুঝা যাইবে যে, মামুলী ধর্মান্তরে ভারতের কাজ নাই। যে ধর্মান্তরে লোকের আত্মশুদ্ধি ও আত্মোপলব্ধি ঘটে তেমন ধর্মান্তরের আজ বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু এরূপ ধর্মান্তরের কথা তাহারা আদৌ ভাবে না। ভারতকে যাহারা দীক্ষিত করিতে চায় তাহাদের বলি, 'আগে নিজে তো বাঁচ'।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৩-৪-৩১]

আমার যখন যুবাবয়স, স্মরণ আছে, কোন হিন্দু খ্রীষ্টান হয়। সযত্নে লালিত-পালিত এক হিন্দু যীশুর নামে গো-মাংস খাইল, মদ ধরিল ও জাতীয় পোশাক ছাড়িল—দীক্ষা বলিতে গোটা শহরের লোক ইহাই মাত্র বুঝিল। পরবর্তী কালে একাধিক মিশনারী বন্ধুকে

বলিতে শুনিয়াছি যে, ধর্মান্তর গ্রহণ করিলে বদ্ধ জীব মুক্ত হয়, দারিদ্র্য ঘুচিয়া যায়, জীবন স্বাচ্ছন্দ্যে ভরিয়া ওঠে। ভারতের কোণায় কোণায় পর্যটন প্রসঙ্গে দেখিতে পাই যে, ভারতে জন্ম হইয়াছে বলিয়া ভারতীয় খ্রীষ্টানেরা যেন লজ্জায় মরিয়া যায় ; পূর্বজদের ধর্ম ও পোশাক তো ধিক্‌কারের বস্তু বটেই। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের ইউরোপীয়দের অনুকৃতি যদি বিশ্রী (বিশ্রী নিশ্চয়ই) হয় তো ভারতীয় খ্রীষ্টানদের ইউরোপীয়দের অনুকৃতি দেশের দ্রোহিতা, এমন কি তাহাদের গৃহীত নবধর্মেরও দ্রোহিতা ছাড়া কি! নিউ টেস্টামেণ্টের কোন অধ্যায়ের কোন অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, মাংস খাইলে যদি তোমার প্রতিবেশীর মনে আঘাত লাগে তবে মাংস খাইবে না। আমি মনে করি মাংস বলিতে এখানে মদ ও পোশাকও বুঝায়। পুরাতনে গলদ থাকে তো তাহা নির্মমভাবে পরিহার করার কথা বুঝা যায়, কিন্তু গলদের প্রসঙ্গই যদি না থাকে, উল্টা পুরাতন রীতিবিশেষ যদি বাঞ্ছনীয় হয় আর তাহা পরিহার করিলে স্বজন স্বগোত্র অতীব ব্যথিত হইবে জানিয়াও তাহা পরিহার করি, তবে তাহা পাপ। ধর্মান্তরকরণ যেন বিজাতীয়করণ না হয়। পুরাতনের মন্দ পরিহার, নূতনের ভাল গ্রহণ এবং সঙ্গে সঙ্গে নূতনের দোষ বিষবৎ পরিহার—এই তো হওয়া চাই ধর্মান্তরের স্বরূপ। ধর্মান্তর গ্রহণে লোকের জীবন একনিষ্ঠ দেশপ্রেমে, ভগবানে সমধিক আত্ম-সমর্পণে, সমধিক চিত্তশুদ্ধিতে সমৃদ্ধ হওয়ার কথা। ভারতীয় খ্রীষ্টানদের অনেকে মাতৃভাষা পরিত্যাগ করে, ছেলেমেয়েদের কেবল ইংরেজি বলিতে শিখায়। সত্যই ইহা শোচনীয় নয় কি ? যে দেশে তাহাদের বসবাস করিতে হইবে সে দেশ হইতে এভাবে নিজেদের তাহারা একেবারেই ছিন্ন করে না কি ?

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২০-৮-২৫]

অগ্রে মধ্যে কি অন্তে খ্রীষ্টের বাণী (gospel) অনুসারে চলাই সর্বোত্তম ফলপ্রদ পন্থা। ধর্মপ্রচার আমার ভাল লাগে না, তাহা আমার অন্তর স্পর্শ করে না ; প্রচারক মিশনারীদের আমি সন্দেহের চক্ষে দেখি। যাহারা প্রচার করিয়া নিজ নিজ উপলব্ধি অনুসারে জীবন যাপন করে তাহাদের আমি ভালবাসি। জীবন তাহাদের নীরব কিন্তু দৃষ্টান্ত তাহাদের অতীব প্রভাবোৎপাদক। প্রচার যে কি করিতে হইবে তাহা আমি বলিতে পারি না, কিন্তু এ কথা বলিতে পারি যে, সেবাময় একান্ত সাদাসিধা জীবনই প্রকৃষ্ট প্রচার। গোলাপের প্রচারের আবশ্যকতা নাই। সুবাস ছড়াইয়া তাহা নিরস্ত। সুবাসই প্রচার। মানুষের বুদ্ধি যদি গোলাপের থাকিত আর বহু প্রচারক উহা নিযুক্ত করিতে পারিত তবে দেখা যাইত যে, সুবাসে যত গোলাপ বিক্রি হয়, প্রচারে তত হয় না। ধার্মিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সৌরভ গোলাপের সৌরভ অপেক্ষা অনেক বেশী মনোরম, অনেক বেশী সূক্ষ্ম।

[হরিজন, ২৯-৩-৩৫]

নিজ ধর্ম বদলাইবার কথা যেমন আমি ভাবিতে পারি না, তেমনি কোন খ্রীষ্টান মুসলমান পার্শী বা ইহুদিকে তাহার ধর্মমত বদলাইতে আমি বলিতে পারি না। আর তাই অন্য ধর্মাবলম্বীদের ভুলত্রুটি আমার স্বধর্মীয়দের মারাত্মক ভুলত্রুটি অপেক্ষা বেশী করিয়া দেখি না। যেহেতু নিজ ধর্ম অনুসারে নিজে চলিতে ও আমার স্বধর্মীয়দের তদনুসারে চলিতে উদ্বুদ্ধ করিতে আমায় হিমশিম খাইতে হয়, সেইহেতু অন্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে ধর্ম প্রচারের কথা আমি মনে ঠাঁইও দেই না। 'অন্যের বিচার করতে যেও না, তারাও তোমার বিচার করবে,' ইহা অতি খাঁটি ব্যবহারিক সত্য কথা। গোটা ভারতবাসীদের, নিদেনপক্ষে সাদাসিধা গ্রামবাসীদের দীক্ষিত করিব ; যে সমাজ-সৌধ

নানা ত্রুটি সত্ত্বেও প্রাচীন কাল হইতে ভিতর-বাহিরের শত ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করিয়া দণ্ডায়মান তাহা ধূলিসাৎ করিব—এরূপ ভাব পোষণ না করিয়া ধনবান বৃহৎ বৃহৎ মিশন যদি সেবার জন্যই লোকের সেবা করে তো সত্যসত্যই উহারা ভারতের সেবা করিবে, এই বিশ্বাস আমার দিন দিন দৃঢ় হইতেছে। মিশনারীরা বা আমরা চাই কি না চাই, হিন্দুধর্মে যাহা সত্য তাহা থাকিবেই, আর যাহা অসত্য তাহা যাইবেই। টিকিয়া থাকিতে হইলে চলতি ধর্মসমূহের সঞ্জীবন শক্তিতে শক্তিমান হইতে হইবে।

[হরিজন, ২৮-৯-৩৫]

শুদ্ধি ও তব্‌লিগ্‌

আমার মনে হয় ধর্মান্তরকরণ বলিতে খ্রীষ্টানেরা, কিয়ৎপরিমাণে মুসলমানেরাও যাহা বোঝে তেমন কিছু হিন্দুধর্মে নাই। আমি মনে করি, আর্যসমাজের প্রচার-অভিযান খ্রীষ্টানদের অনুকরণে পরিকল্পিত। এই নূতন পদ্ধতি আমার ভাল লাগে না। লাভ অপেক্ষা ইহা দ্বারা ক্ষতি হইয়াছে বেশী। যাহা একান্তই হৃদয়ের ব্যাপার, জীব ও তাহার স্রষ্টার ব্যাপার বলিয়া স্বীকৃত, তাহাকে লোকে নীচ স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগাইয়াছে, পতিত করিয়াছে।...আমার সহজাত হিন্দু-বৃত্তি বলে যে, সকল ধর্মই অল্পাধিক সত্য। সবই ভগবান হইতে প্রবাহিত, কিন্তু উৎসের বিবিধ ধারার বাহক অপূর্ণ মানুষ আর তাই তাহারাও অপূর্ণ। যে ধর্মে যাহার জন্ম সে ধর্ম অবলম্বনে নরনারী যদি পূর্ণতা লাভের চেষ্টা করে তো তাহাই হইবে প্রকৃত শুদ্ধি। শুদ্ধির যাচাইয়ের কষ্টিপাথর চরিত্র। নৈতিক উন্নতিই যদি না হইল তো এ-ঘর ছাড়িয়া ও-ঘরে যাওয়া নিষ্ফল নয় কি? আমার স্বধর্মীয়েরা যদি নিজ আচরণে ভগবানকে প্রতিনিয়ত খণ্ডন করে, তবে তাঁর সেবার্থে (তাহাই না শুদ্ধি বা তব্‌লিগের লক্ষ্য ?) লোককে নিজ ধর্মে দীক্ষিত করার কোন

অর্থ হয় কি? 'আগে তো নিজে বাঁচ'—পার্থিব ক্ষেত্র অপেক্ষা পারমার্থিক ক্ষেত্রে এ কথা অনেক বেশী সত্য।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৯-৫-২৪]

২২

আমি হিন্দু কেন?

বংশ-পরম্পরার প্রভাবে আমি বিশ্বাস করি, হিন্দুর ঘরে জন্মিয়াছি তাই আমি হিন্দু রহিয়া গিয়াছি। উহা যদি আমার নৈতিক বোধ বা আধ্যাত্মিক বিকাশের অন্তরায় হইত তবে তাহা পরিত্যাগ করিতাম। পরীক্ষান্তে দেখিতে পাইয়াছি যে যত ধর্মমতের কথা আমার জানা আছে তাহার মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা উদার। ধরা-বাঁধা উপাসনা-পদ্ধতির ডোরে বাঁধা নয় বলিয়া আমার কাছে ইহা খুব ভাল লাগে, কারণ সাধকের আত্মবিকাশের চূড়ান্ত সুযোগ ইহাতে রহিয়াছে। আমার ধর্মই একমাত্র ধর্ম এই ভাব নাই বলিয়া হিন্দুরা অন্য ধর্মবিশ্বাসকে মর্যাদা তো দেয়ই, অন্য ধর্মে যাহা ভাল তাহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, তাহা আত্মসাৎ করিয়া লয়। সব ধর্মেই অহিংসার কথা আছে কিন্তু হিন্দুধর্মে (জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মকে আমি হিন্দুধর্ম হইতে আলাদা করিয়া দেখি না) ইহার বিকাশ ও প্রয়োগ সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। কেবল মনুষ্যমাত্রেই নয়, জীবমাত্রের একত্বে হিন্দু বিশ্বাস করে। হিন্দু গো-পূজা করে; আমি মনে করি জীবে-দয়ার বিকাশ ক্ষেত্রে ইহা এক অতুলনীয় অবদান। জীবমাত্রই এক অতএব জীবমাত্রই অবধ্য এই বিশ্বাসের ইহা ব্যবহারিক রূপ। এই বিশ্বাস হইতেই পুনর্জন্মবাদের উদ্ভব হইয়াছে। পরিশেষে সত্যানুসন্ধানের ফল স্বরূপ আমরা পাইয়াছি অপূর্ব বর্ণাশ্রম ধর্ম।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২০-১০-২৭]

যে কারণে আমি নিজেকে সনাতনী হিন্দু বলি তাহা এই ঃ

১। আমি বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ এবং হিন্দু-ধর্মশাস্ত্র বলিতে যাহা বুঝায় তাহাতে বিশ্বাস করি আর তাই অবতার ও পুনর্জন্মেও বিশ্বাস করি।

২। আমার বিশ্বাস, বর্ণাশ্রম ধর্মে—উহার বৈদিক অর্থে, উহার প্রচলিত বিকৃত অর্থে নয়—আমি বিশ্বাস করি।

৩। গো-রক্ষা বলিতে সাধারণতঃ লোকে যাহা বুঝে তাহা অপেক্ষা অনেক ব্যাপক অর্থে গো-রক্ষায় আমি বিশ্বাস করি।

৪। মূর্তি-পূজায় আমি অবিশ্বাস করি না।

পাঠক লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, বেদ তথা শাস্ত্র অপৌরুষেয়, এ কথা আমি বলি নাই ; ভাবিয়া চিন্তিয়াই সে কথা বলি নাই। বেদই কেবল অপৌরুষেয় এরূপ আমি মনে করি না। আমি বিশ্বাস করি যে, বাইবেল কোরান জেন্দ্ আভেস্তও তদ্রূপ ঈশ্বরানুপ্রাণিত। হিন্দু-শাস্ত্রে বিশ্বাস করি বলিয়াই সকল বাণী সকল সূক্ত ঈশ্বরানুপ্রাণিত বলিয়া মানিতে হইবে তাহা নয়। এই সকল বিস্ময়কর গ্রন্থের সাক্ষাৎ জ্ঞান আমার আছে তাহাও নয়। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রের উপদেশের মূলে যে সব সত্য আছে তাহা জানার ও বুঝার দাবি আমি করি। ব্যাখ্যা যতই পাণ্ডিত্যপূর্ণ হোক, যুক্তি ও নৈতিকতার বিরোধী হয় তো আমার কাছে অগ্রাহ্য। বর্তমান শঙ্করাচার্য ও শাস্ত্রীরা যদি বলেন যে তাঁহারা হিন্দু-শাস্ত্রের নির্ভুল ব্যাখ্যা করেন তো তাঁহাদের সে দাবি মানিতে প্রস্তুত নহি। পক্ষান্তরে, এ কথাই আমার মনে হয় যে আমাদের এই সকল গ্রন্থের জ্ঞান বর্তমানে একেবারেই মাথামুণ্ডহীন, এলোমেলো। যে লোক পূর্ণ অহিংস পূর্ণ সত্যসন্ধ পূর্ণ ব্রহ্মচর্যপরায়ণ নয় এবং যে ধনতৃষ্ণা ত্যাগ না করিয়াছে বা অপরিগ্রহী না হইয়াছে, সে লোক শাস্ত্র ঠিক ঠিক বুঝিতে অক্ষম—এই শাস্ত্রবচনে আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি। গুরুবাদে আমি

বিশ্বাস করি কিন্তু লাখো লাখো লোককে গুরু বিনাই চলিতে হইবে। কারণ পূর্ণ নির্মলতা ও পূর্ণ জ্ঞান এই দুইয়ের সংযোগ এ যুগে অতি বিরল। কিন্তু স্বধর্মের সার আদৌ বুঝা যাইবে কিনা এ বিষয়ে কাহারও হতাশ হওয়ার কিছু নাই, কারণ হিন্দুধর্মের তথা অন্য সব ধর্মের মৌলিক বস্তু অপরিবর্তনীয় ও সহজবোধ্য। ভগবান আছেন, ভগবান এক, পুনর্জন্ম আছে, মোক্ষ আছে—হিন্দুমাত্রে এ কথায় বিশ্বাস করে···। আমি সংস্কারক। অণু-পরমাণুতে আমি সংস্কারক। কিন্তু সংস্কারের উৎকট আগ্রহে হিন্দুধর্মের যে সব মূল বস্তু, তাহাতে আমি হস্তক্ষেপ করিতে চাই না। বলিয়াছি যে মূর্তিপূজায় আমি অবিশ্বাস করি না। মূর্তি দর্শনে আমার অন্তরে ভাবের আবেশ হয় না কিন্তু আমি মনে করি, মূর্তি মানব-স্বভাবের এক অঙ্গ। প্রতীক না হইলে আমাদের চলে না। গির্জায় গেলে অন্য স্থান হইতে লোকে অধিক সমাহিত হয় কেন? মূর্তি আরাধনার এক সহায়। মূর্তিকে কোন হিন্দু ভগবান জ্ঞান করে না। মূর্তিপূজা পাপ নহে।

উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যাইবে যে হিন্দুধর্ম একমাত্র ধর্ম হওয়ার দাবি করে না। পৃথিবীর সকল ধর্মোপদেষ্টাদের পূজার আসন হিন্দুধর্মে আছে। সাধারণ অর্থে ইহা মিশনারী ধর্ম নয়। সত্য বটে বহু উপজাতিকে হিন্দুধর্ম আত্মসাৎ করিয়াছে কিন্তু করিয়াছে ক্রমবিকাশের অদৃশ্য পথে। হিন্দুধর্ম বলে যে, যে যাহার মত বা ধর্ম অনুসারে ভগবানের আরাধনা করিতে পারে। কোন ধর্মের সঙ্গে উহার বিরোধ নাই।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৬-১০-২১]

২৩

বৌদ্ধধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলাম

বুদ্ধ ভগবানে বিশ্বাস করিতেন না এ কথা কত মুখেই না শুনিয়াছি। আর বৌদ্ধধর্মের মর্ম ব্যাখ্যা করার দাবি যাঁহারা করেন তাঁহাদের গ্রন্থে কতবারই না এ কথা পড়িয়াছি। আমি সবিনয়ে বলিব যে এরূপ বিশ্বাস করিলে বুদ্ধদেবের শিক্ষার মূল জিনিস ভাসিয়া যায়......... ভগবানের নামে সে যুগে যে সকল জঘন্য ব্যাপার চলিত তাহা তিনি খণ্ডন করিয়াছিলেন আর সঙ্গত কারণেই করিয়াছিলেন। তাহা হইতেই এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। দ্বেষপরায়ণ, অনুতাপপরায়ণ, পার্থিব রাজাদের ন্যায় লুব্ধ উৎকোচে তুষ্ট এবং সম্ভবত প্রিয়াপ্রিয়-বিচারী ভগবান নামধেয় কেহ আছে, এই ধারণা তিনি অবশ্যই খণ্ডন করিয়াছিলেন। ভগবান নামক কেহ নিজ তুষ্টির জন্য নিজের সৃষ্ট পশুর তাজা রক্ত চাহিতে পারে এই-যে বিশ্বাস, তাহার বিরুদ্ধে তাঁহার অন্তরাত্মা ঘোর বিদ্রোহ করিয়াছিল। তাই তিনি ভগবানকে তাঁর নিজ আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ও বেদখলকারীকে শুভ্র সিংহাসন (যাহা সে দখল করিয়াছিল বলিয়া মনে হইয়াছিল) হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। বিশ্ব চলে নিত্য ও অপরিবর্তনীয় নৈতিক বিধির নিয়মে এ কথা তিনি জোর দিয়া বলিয়াছিলেন, এই সত্য তিনি পুনর্বার ঘোষণা করিয়াছিলেন। বিধিই ভগবান, এ কথা তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে প্রচার করিয়াছিলেন।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৪-১১-২৭]

ভগবানের বিধি নিত্য ও অপরিবর্তনীয় এবং ভগবান হইতে তাহা অভিন্ন। ভিন্ন হইত তো তাঁর পূর্ণতাই অপূর্ণ থাকিয়া যাইত। বিধি ভগবান হইতে ভিন্ন এই ধারণা হইতে বুদ্ধ ভগবান মানিতেন না

কেবল নৈতিক বিধি মানিতেন এই মারাত্মক বিভ্রমের সৃষ্টি হইয়াছে। আর স্বয়ং ভগবান সম্পর্কে বিভ্রম সৃষ্ট হওয়ার দরুন নির্বাণ-এর মত মহাশব্দের অর্থ যথাযথ নির্ণয়ে ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। নির্বাণ অর্থে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাওয়া নিশ্চয় নয়। বুদ্ধ-জীবনের সার কথা যদি বুঝিয়া থাকি তো নির্বাণের অর্থ আমাদের সব কিছু নীচতার, কদাচারের, কুপ্রবৃত্তির নির্বাণ, কুপথে যাহা টানে তাহার নির্বাণ অর্থাৎ নিঃশেষে অবসান। নির্বাণ মানে কবরের মৃত্যু-বিবশ তামস শান্তি নহে ; নির্বাণ মানে চেতন শান্তি, আত্ম সম্বন্ধে সচেতন আত্মার জাগ্রত আনন্দ, অক্ষর পুরুষে লীন হইয়া যাওয়ার সজাগ ভূমানন্দ।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৪-১১-২৭]

ভগবানকে বুদ্ধ তাঁর নিজ আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। মানবসমাজের প্রতি ইহা তাঁহার মস্ত বড় দান। কিন্তু আমি মনে করি যে, তাহা অপেক্ষা আরও বড় মানবসেবা তিনি করিয়াছেন এই শিক্ষাদান করিয়া যে, যত নগণ্যই হোক জীব অবধ্য।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২০-১-২৭]

আমার বলিতে বাধে না যে, ইতিহাসের যীশু আমার অন্তরে সাড়া জাগায় না। কেহ যদি সপ্রমাণ করে যে যীশু বলিতে কোন মানুষ ছিল না, সুসমাচারে (গস্‌পেলে) বর্ণিত চিত্র লেখকের মানসকল্পিত চিত্র, তাহাতে আমার কিছু আসে-যায় না। কারণ তাহা সত্ত্বেও গিরি-প্রবচন আমার কাছে বরাবর সত্যই থাকিবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩১-১২-৩১]

একমাত্র যীশুই ভাগবত বিভূতিতে ঐশ্বর্যশালী, এ কথা আমি মানি না। কৃষ্ণ বা রাম, মহম্মদ বা জরথুস্ত্র, ইহারাও তুল্য দৈবী শক্তি

সম্পন্ন। তদ্রূপ বাইবেলের সব কথা আমি ভগবত-অনুপ্রাণিত বলিয়া মানি না, যেমন মানি না বেদের বা কোরানের সব কথা ঈশ্বরাণুপ্রেরিত বলিয়া। সমগ্রভাবে দেখিলে এই সব গ্রন্থ নিঃসন্দেহে ঈশ্বরাণুপ্রাণিত, কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখিলে অনেক জায়গায় সে অনুপ্রেরণা মিলে না। বাইবেল আমার কাছে গীতা ও কোরানের মতই ধর্মগ্রন্থ।

[হরিজন, ৬-৩-৩৭]

যীশুকে আমি কোন্ দৃষ্টিতে দেখি? আমি তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টাদের একজন বলিয়া মানি। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরা তাঁহাকে ভগবানের একমাত্র পুত্র বলিয়া মানে। এ কথা মানিলে আমার উপর তাঁহার প্রভাব বাড়িবে আর না মানিলে কমিবে, ইহা কি কখনও সম্ভব? অথবা সে স্থলে কি তাঁহার মহান্ শিক্ষা ও ধর্মোপদেশ হইতে আমি বঞ্চিত হইব? সে কথা আমি মনে করি না।

[দি মডার্ন রিভিউ. অক্টোবর ১৯৪১]

আমার বিশ্বাস, পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক বিচার করা যায় না। প্রয়োজনও তাহার নাই; সেই চেষ্টা অহিতকর। লোক-জীবন উদ্দেশ্যমণ্ডিত হোক সমৃদ্ধ হোক, আমার বিশ্বাস, এই প্রেরণা হইতেই সকল ধর্মের উদ্ভব। যীশু-জীবনের যে বৈশিষ্ট্যের ও অপার্থিব গরিমার কথা উপরে বলিয়াছি, সেই বৈশিষ্ট্য ও গরিমার কারণে খ্রীষ্ট কেবল খ্রীষ্টানদেরই নহেন, খ্রীষ্ট সমস্ত জগতের সকল জাতির ও সকল লোকের—তা তাহারা যে দেশেরই অধিবাসী হোক, যে নামেই পরিচিত হোক, যে মতাবলম্বীই হোক, অথবা পূর্বজদের কাছ হইতে প্রাপ্ত যে ধর্মেরই অনুগামী হোক আর যে দেবতারই পূজা করুক।

[দি মডার্ন রিভিউ, অক্টোবর ১৯৪১]

গিরি-প্রবচন (সারমন্ অন্ দি মাউণ্ট) ও ভগবদ্গীতার মধ্যে আমি কোন ব্যবধান দেখি না। যে বস্তুর চিত্তাকর্ষক চিত্র গিরি-প্রবচন আঁকিয়াছে, গীতা সে বস্তুকে বিজ্ঞানের সূত্রে গাঁথিয়াছে। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ইহাকে বিজ্ঞান-গ্রন্থ বলা যাইবে না কিন্তু প্রেম-ধর্মের---নিজেকে বিলাইয়া দেওয়ার ধর্মের—বিজ্ঞানসম্মত বিচার-বিশ্লেষণ ইহাতে রহিয়াছে। সেই ধর্মেরই অত্যাশ্চর্য ব্যঞ্জনা গিরি-প্রবচনে দেখিতে পাই। ওল্ড টেস্টামেণ্টের স্থানবিশেষ পড়িয়া আমার মন অভক্তিতে ভরিয়া গিয়াছিল ; নিউ টেস্টামেণ্ট পড়িয়া আমি সন্তোষ ও অশেষ আনন্দ লাভ করি। ধরুন, আমার গীতা কেহ কাড়িয়া লইয়াছে আর উহার সব শ্লোক আমি ভুলিয়া গিয়াছি কিন্তু গিরি-প্রবচনের প্রতিলিপি যদি হাতে পাই তো তাহা হইতে, গীতা পড়িয়া যে আনন্দ পাই সে আনন্দ পাইব।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২২-১২-২৭]

যে অর্থে খ্রীষ্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্ম শান্তিকামী, ইসলামও সে অর্থে শান্তিকামী। মাত্রাভেদ তো আছেই কিন্তু উদ্দেশ্য সব ধর্মেরই এক—শান্তি।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২০-১-২৭]

একেশ্বরবাদে ইসলামের নিভাঁজ বিশ্বাস এবং মানুষে-মানুষে ভাই-ভাই এই সত্য অনুযায়ী নামত স্বধর্মীয়দের প্রতি আচরণ—ভারতীয় সংস্কৃতিতে এই দুইটি ইসলামের বিশেষ দান। এই দুইটিকে বিশেষ দান বলিলাম তাহার কারণ মানুষমাত্রই ভাই এই ভাব দর্শনের ধোঁয়ায় হিন্দুধর্মে বড় বেশী আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। তদ্রূপ, যদিও দার্শনিক হিন্দুধর্মে এক ভগবান ব্যতীত দেব নাই কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে হিন্দুধর্ম ইসলামের মত উগ্র একেশ্বরবাদী যে নয় এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২১-৩-২৯]

ফাদার বলিলেন, "হিন্দুধর্ম যদি খ্রীষ্টধর্মের মত একেশ্বরবাদী হয় তবে খ্রীষ্টধর্ম ও হিন্দুধর্ম মিলে-মিশে ভারতের সেবা করতে পারে।"

গান্ধীজী বলিলেন, "এরূপ সহযোগিতা আমি মনেপ্রাণে চাই। কিন্তু আজিকার খ্রীষ্টান মিশনসমূহ যদি হিন্দুধর্মকে লোকের কাছে উপহাসাস্পদ করতে থাকে আর বলে যে, হিন্দুধর্ম ত্যাগ না করলে, হিন্দুধর্মের নিন্দাবাদ না করলে মুক্তি নাই—তবে তা হতে পারে না। কিন্তু কর্তব্যবোধেই গোলাপ যেমন কথাটি না বলে তার সুবাস ছড়ায়, তেমনই কোন ধর্মপ্রাণ খ্রীষ্টান যদি নীরবে কাজ করে যায় ও নিজ জীবনের সৌরভ ছড়াতে থাকে, তবে হিন্দু সমাজের উপর তার ক্রিয়া না হয়ে যায় না এ কথা আমি ভাবতে পারি। প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। তা হলে পৃথিবীতে শান্তি আসবে ও লোকমনে সৌহার্দ্যের ভাব জন্মাবে। কিন্তু খ্রীষ্ট-ধর্ম যতদিন 'যুদ্ধং দেহি' ধর্ম থাকবে, 'পেশল' ধর্ম থাকবে, ততদিন শান্তি সৌহার্দ্য নেই। বাইবেলে ধর্মের এই রূপ নেই। জার্মানিতে ও অন্য নানা দেশে তা দেখতে পাই।"

"কিন্তু ভারতবাসীরা যদি একেশ্বরবাদী হয়, যদি পৌত্তলিকতা বর্জন করে তবে কি সব অসুবিধা দূর হয়ে যাবে না?"

"তাতে কি খ্রীষ্টানেরা তুষ্ট হবে? তারা সকলে কি একমত?"

"না", ক্যাথলিক ফাদার বলিলেন, "খ্রীষ্টানদের সকল সম্প্রদায় একমত নয়।"

"তবেই দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার প্রস্তাব অব্যবহারিক। খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলাম একেশ্বরবাদী বলে দাবি করে। এখন জিজ্ঞাস্য, এ দুই কি মিলে গেছে? এই দুই যদি না মিলে থাকে তো আপনার

প্রস্তাব মত খ্রীষ্টধর্মের ও হিন্দুধর্মের মিলনের আশা আরও বেশী ক্ষীণ। সমাধানের পথ যে কি তা আমি জানি; কিন্তু তার আগে বলতে চাই যে, হিন্দুরা বহু দেবে বিশ্বাস করে, মূর্তি পূজা করে—আপনাদের এই ধারণা একেবারেই ভুল। তারা অনেক দেবতার কথা বলে বটে কিন্তু এ কথাও অতি স্পষ্টভাবে বলে যে, ভগবান এক, সকল দেবের দেব। অতএব হিন্দুরা বহু দেব মানে এ কথা বলা অসঙ্গত, তবে অনেক জগৎ তারা মানে। মনুষ্য-জগৎ ও পশু-জগতের মত দেব-জগৎও আছে, যেখানে দেব নামক উন্নততর অধিবাসীর বাস—চক্ষে তাদের আমরা দেখি না বটে, কিন্তু তাদের অস্তিত্ব আছে। যত গোল বেধেছে 'দেব বা দেবতা'-র ইংরেজী অনুবাদে—দেব বা দেবতা ছাড়া অন্য কোন ভাল প্রতিশব্দ আপনারা খুঁজে পান নি বলে; কিন্তু গড্ বা ঈশ্বর দেবাদিদেব, দেবেরও দেব। তবেই দেখতে পাচ্ছেন, বিবিধ দৈব সত্তার প্রতিশব্দ হিসাবে 'গড্'-এর ব্যবহার হেতু যত বিভ্রমের সৃষ্টি হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি আমি খাঁটি হিন্দু কিন্তু আমি কখনও বহু দেবে বিশ্বাস করি না। ছেলেবেলায়ও সে বিশ্বাস আমার ছিল না আর কেউ আমায় সে শিক্ষা দেয়ও নি।"

মূর্তিপূজা

মূর্তিপূজার কথায় বলব যে, কোন না কোন রূপ মূর্তিপূজা ছাড়া লোকের চলে না। মুসলমান তার ভগবানের নিবাস-স্থান মসজিদের জন্য প্রাণ দেয় কেন? খ্রীষ্টান গির্জায় যায় কেন? কোন শপথ গ্রহণ করতে হলে বাইবেল হাতে নেয় কেন? এসবে অবশ্য আপত্তি করার কিছু নেই। মসজিদ বা সমাধি-সৌধ নির্মাণকল্পে কুবেরের ধন দান করা পৌত্তলিকতা ছাড়া কি? আর রোমান ক্যাথলিকেরা

ওই-যে পাথরে-খোদা অথবা চটে-বা-কাঁচে-আঁকা নেহাত কল্পিত প্রতিমূর্তির সম্মুখে নতজানু হয়, সেই ক্রিয়াকে কি আখ্যা দেবেন ?"

ক্যাথলিক ফাদার প্রতিবাদ করিলেন, "কিন্তু আমি তো আমার মায়ের ছবি রাখি ও পরম ভক্তিভাবে তা চুম্বন করি। পূজা তাঁর আমি করি না, সন্তদেরও না। যখন ভগবানের আরাধনা করি, তখন স্রষ্টারূপে, মানুষের অপেক্ষা মহত্তর জ্ঞানে তাঁর পূজা করি।"

"ঠিক তেমনি আমরা পাথর পূজা করি না, করি পাথরে গড়া বা ধাতুতে তৈরী ভগবানের মূর্তির, হোক না তা অসংস্কৃত ও সেকেলে।"

"কিন্তু গ্রামের লোকেরা দেবতা জ্ঞানে পাথর পূজা করে।

"না, তা নয়। আপনাদের আমি বলি, ভগবান অপেক্ষা ন্যূন কিছুর উপাসনা তারা করে না। আপনারা কুমারী মেরীর সম্মুখে হাঁটু গেড়ে বসেন, 'আমাদের হয়ে তাঁর কৃপা ভিক্ষা করো' বলে প্রার্থনা করেন ; ভাল, একে কি বলব ? ভগবান ও আপনাদের মধ্যে তাঁকে যোগসূত্র হতে বলেন। হিন্দুও তেমনি পাথরের মূর্তির মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গে যোগ সাধন করতে চায়। আপনাদের কুমারীর মধ্যস্থতা চাওয়ার অর্থ বুঝি। মসজিদে গেলে মুসলমানেরা ভয়-ভক্তিতে বিহ্বল হয় কেন, তাদের অন্তর ঊর্ধ্বে পক্ষ বিস্তার করে কেন ? ভাল, সমগ্র বিশ্বটাই কি মসজিদ নয় ? আর ওই যে মাথার উপরকার অনন্ত-বিস্তৃত ঐশ্বর্যময় চন্দ্রাতপ, মসজিদ থেকে তা কি কোন অংশে হীন ? কিন্তু আমি মুসলমানদের বুঝি, তাদের অন্তরের ভাব উপলব্ধি করি। এইটে ভগবানের কাছে যাওয়ার তাদের পথ। সেই অ-কাল পুরুষের কাছে যাওয়ার হিন্দুদেরও এক নিজস্ব পথ আছে। তাঁর কাছে পৌঁছানোর নানা পথ, তা বলে তিনি নানা নন।"

"কিন্তু ক্যাথলিকদের বিশ্বাস, ভগবান তাদের সত্য পথ দেখিয়েছেন।"

"কিন্তু আপনি এ কথা কেন বলেন যে, ভগবানের অভিপ্রায় বাইবেল নামক গ্রন্থেই কেবল বিঘোষিত হয়েছে, অন্য কোন গ্রন্থে হয় নি ? ভগবানের শক্তিকে এরূপ গণ্ডিবদ্ধ করতে যান কেন ?"

"কিন্তু যীশুর কাছে ভগবানের বাণী অলৌকিক উপায়ে এসেছিল আর তার প্রমাণ তিনি দিয়েছিলেন।"

"কিন্তু মহম্মদও অনুরূপ দাবি করেছেন। খ্রীষ্টীয় সাক্ষ্য মানেন তো মুসলিম ও হিন্দু সাক্ষ্যও আপনার না মেনে উপায় নেই।"

"কিন্তু মহম্মদ তো বলেছেন, অলৌকিক কিছু করতে তিনি অসমর্থ।"

"না, অলৌকিক ঘটনা দ্বারা ভগবানের অস্তিত্ব তিনি সপ্রমাণ করতে চান নাই। কিন্তু ভগবানের বাণী তিনি শুনতেন, এ কথা তিনি বলেছেন।

[হরিজন, ১৩-৩-৩৭]

দেব ও বহু দেব

অবতার

ভগবান ব্যক্তি নহেন। সময় সময় মানবদেহে তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন এ কথা অংশত সত্য। তার মানে এই যে, এরূপ ব্যক্তির আচরণ প্রায় ভাগবত আচরণের সদৃশ। ভগবান সর্বত্র বিরাজমান, তাই সকলের ভিতরে তিনি আছেন। অতএব বলা যাইতে পারে যে, সকলেই তাঁর অবতার। কিন্তু এখানে তো কূলকিনারা পাওয়া

যাইবে না। রামকৃষ্ণ আদিতে দৈব ঐশ্বর্য আরোপ করি বলিয়া রামকৃষ্ণ আদিকে অবতার বলা হয়। বস্তুত তাঁহারা মানবমনের সৃষ্টি। সত্য সত্যই তাঁহারা ছিলেন কি ছিলেন না তাহাতে লোকমনে তাঁহাদের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে তাহার ব্যত্যয় হওয়ার নয়। রাম ও কৃষ্ণকে ইতিহাসের পুরুষ বলিলে কতকগুলি জটিলতার সৃষ্টি হয় এবং নানা যুক্তিতর্ক দ্বারা তাহা খণ্ডন করিতে হয়।

সত্য তো এই যে ঈশ্বরই একমাত্র শক্তি। জীবনের তিনি মূল কারণ। তিনি শুদ্ধ, নিষ্কলঙ্ক চেতনা। তিনি শাশ্বত। অথচ পরম আশ্চর্যের কথা, তাঁর এই সর্বব্যাপী সাক্ষাৎ সান্নিধ্যের সুবিধা বা শরণ লইতে সকলে পারে না।

তড়িৎ এক মস্ত শক্তি। সকলে এই শক্তির সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে না। উহা উৎপাদন করার কতকগুলি বিধি-নিয়ম আছে। উহা জড় শক্তি। উহার উৎপাদনের নিয়ম-পদ্ধতি কঠোর সাধনায় আয়ত্ত করিলে তবে উহার ব্যবহারের সুযোগ ঘটে।

তদ্রূপ ভগবান নামক চেতন-শক্তি অন্তরে উপলব্ধি করিতে হইলে তাঁর বিধি জানিতে হয় ও তদনুসারে চলিতে হয়।

[হরিজন, ২২-৬-৪৭]

হিন্দুধর্ম বিশাল রত্নাকরের ন্যায় রত্নগর্ভা। যত গভীরে ডুবিবেন তত বেশী রত্ন পাইবেন। হিন্দুধর্মে ভগবানের নানা নাম। ভারতের অসংখ্য লোকে রাম ও কৃষ্ণকে ইতিহাসের পুরুষ বলিয়া মানে, ইহাতে সংশয় নাই। ভগবান দশরথের পুত্র রামরূপে ধরাধামে নর-দেহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার উপাসনা করিলে মোক্ষ মিলে, এ কথা লাখো লোকে অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া মানে। কৃষ্ণের সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। ইতিহাস, কল্পনা ও তথ্য এই তিনের এমন তালগোল পাক লাগিয়াছে যে, কার সাধ্য সেই জট খোলে।

ভগবানে যে সব নাম ও রূপ আরোপ করা হইয়াছে সে সবকে আমি প্রতীক বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। অতএব যাঁর নাম হৃদয়ে অঙ্কিত হইলে মানুষের ত্রি-তাপ দূর হইয়া যায়, দশরথের পুত্র সীতাপতিরূপে বর্ণিত রামকে আমি সেই সর্বশক্তিমান পরমাত্মা হইতে অভিন্ন জ্ঞান করি।

[হরিজন, ২-৬-৪৬]

২৫

মন্দির ও মূর্তি

মন্দিরে যাওয়া পাপ বা কুসংস্কার, এরূপ আমি মনে করি না। দেখিতেছি কোন না কোন রূপ সমবেত প্রার্থনা ও সমবেত প্রার্থনার স্থান ছাড়া লোকের চলে না। মন্দিরে মূর্তি থাকিবে কি থাকিবে না, তাহা প্রকৃতি ও রুচির ব্যাপার। হিন্দু-মন্দিরে বা রোমান ক্যাথলিক গির্জায় মূর্তি থাকে বলিয়া তাহা অপবিত্র বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন, আর মসজিদে বা প্রোটেস্টাণ্ট উপাসনালয়ে মূর্তির ঠাঁই নাই বলিয়া তাহা পবিত্র ও কুসংস্কারমুক্ত এ কথা আমি মানি না। এই-যে প্রতীক ক্রশ বা গ্রন্থ, তাহা তো সহজেই পৌত্তলিকতায় ও কুসংস্কারে পরিণত হইতে পারে। আর বাল-কৃষ্ণের বা মেরীর পূজাও উন্নয়নকারী ও কুসংস্কারমুক্ত হইতে পারে। সবই নির্ভর করে উপাসকের চিত্তবৃত্তির উপর।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৫-১১-২৫]

মানবগোষ্ঠীর সকলে আমরা দার্শনিক নহি। আমরা পৃথিবীর জীব, একান্তই বস্তুবাদী। নিরাকার অদৃশ্য ভগবানের চিন্তনে আমাদের তৃষ্ণা মিটে না। এভাবে কি ওভাবে এমন কিছু না হইলে আমাদের চলে না যাহা আমরা চোখে দেখিতে পারি, হাতে স্পর্শ করিতে পারি, যাহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে পারি—তাহা বই-ই হোক বা পাথরে-তৈরী গৃহই হোক, শূন্য বা মূর্তি সম্বলিত। কাহারও তুষ্টি গ্রন্থে, কাহারও বা শূন্য ভবনে; আবার ওই সব শূন্য ভবনে কাহারও অধিষ্ঠান দেখিতে না পাইলে অপর অনেকের মন মানে না। তাই তো বলি, এই সব মন্দিরকে নানা কুসংস্কারের

পীঠস্থান করিবেন না। দেবগৃহেই যাইতেছি এই মনোভাব হইতে এই সব মন্দিরে যান তো প্রতিবার শুদ্ধ হৃদয়ে গৃহে ফিরিবেন, সাক্ষাৎ ভগবানে আপনার মতি দিন দিন দৃঢ় হইবে।

[হরিজন, ২৩-১-৩৭]

চিত্তশুদ্ধির কামনায় লোকে মন্দিরে যায়। সাধক নিজের ভিতরকার সর্বোত্তম বস্তুর সন্ধান পায়। নিঃস্বার্থভাবে কেহ কাহাকে প্রণাম করে তো যাহাকে প্রণাম করিল তাহার সর্বোত্তম গুণ তাহাতে সঞ্চারিত হয়। অল্পাধিক ভুল দেহধারী মাত্রেরই হয়। কিন্তু মন্দিরে লোকে পূজা করে সাক্ষাৎ ব্রহ্মের, যাঁর পূর্ণতার পরিমাপ হয় না। দেহধারীর কাছে দেহধারী পত্র লিখে। উহার উত্তর মিলিবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। আর মিলে তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে উহা হয় হৃদয়বিদারক। ভগবানের কাছে পত্র লেখার জন্য—ভক্তের দৃষ্টিতে ভগবান মন্দির-নিবাসী—কলম কালি এমনকি কথারও প্রয়োজন নাই। নীরব উপাসনাই সেখানে পত্র, আর ওই পত্রের উত্তর মিলেই মিলে। গোটা অনুষ্ঠানটাই বিশ্বাসের দিব্য অনুশীলন—দিব্য অভিব্যক্তি। চেষ্টা এখানে বিফল হয় না, অন্তর্দাহ ইহাতে নাই, ভুল বুঝাবুঝির ভয়ও নাই। মন্দির, মসজিদ, গির্জা ইত্যাদিতে উপাসনা করার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব যে কি তাহা পত্র-লেখক অবশ্যই বুঝিতে চেষ্টা করিবেন। এই সব ভিন্ন ভিন্ন দেব-নিবাসের মধ্যে আমি কোন ভেদ দেখি না। এ কথা মনে রাখিলে আমার কথার মর্ম পত্র-প্রেরক অধিকতর স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিবেন। এই সব দেব-নিবাসে মানুষের বিশ্বাস প্রতিবিম্বিত। কোন না কোন ভাবে মানুষ অদৃশ্যে যাইয়া মিলিতে চায়; সেই আকাঙ্ক্ষারই এ সব বাহ্য প্রকট রূপ।

[হরিজন, ১৮-৩-৩৩]

মূর্তি-আরাধক ও মূর্তি-বিঘাতক বলিতে প্রকৃতপক্ষে যাহা বুঝায়, আমার বিশ্বাস আমি একাধারে সেই তুইই। মূর্তিপূজার পিছনে যে ভাব রহিয়াছে তাহার প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল। মানুষের অগ্রগতির তাহা মস্ত বড় সহায়। এই যে হাজার হাজার পবিত্র মন্দির আমাদের এই দেশকে শুচি-শুদ্ধ করিতেছে তাহাদের রক্ষার জন্য জীবন পাত করার শক্তি আমার লাভ হয় তো কৃতকৃতার্থ হইব।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৮-৮-২৪]

যে ধর্মান্ধতা নিজ উপাস্য ভগবানের উপাসনা ব্যতীত অন্য কোনরূপ উপাসনার বিরোধী সেই সূক্ষ্ম মূর্তিপূজার উপর আমি আঘাত হানিতেছি আর সেই অর্থে আমি কালাপাহাড়। যে দেবপূজা শিলাখণ্ড বা স্বর্ণমূর্তিকে সাক্ষাৎ ভগবান জ্ঞান করে সেই সাক্ষাৎ স্থূল মূর্তিপূজা অপেক্ষা পরোক্ষ সূক্ষ্ম মূর্তিপূজা অনেক বেশী মারাত্মক।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৮-৮-২৪]

মন্দিরে, মসজিদে ও গির্জায় অনেক সময় কদাচার দেখা যায়; তাহারও বেশী ঘটে উহাদের অবনতি। তাই বলিয়া এ কথা বলা যাইবে না যে, সকল পুরোহিতই খারাপ বা অতীতে খারাপ ছিল আর সকল গির্জা, মন্দির, মসজিদই কদাচারের ও কুসংস্কারের পীঠস্থান। কোন ধর্মেরই যে দেবস্থান ছাড়া চলে না বিতর্কে এই মূল কথাটাকে আমল দেওয়া হয় নাই। আর তা ছাড়া আমি এ কথাও বলিব যে, যতদিন মানুষ আজিকার অবস্থায় থাকিবে ততদিন এরূপ দেবগৃহ ছাড়া তাহার চলিবে না। এই দেহকে ভগবানের মন্দির বলা হইয়াছে। এই কথা সত্যও, যদিও এরূপ অসংখ্য মন্দির মন্দিরপদবাচ্যই নয়, রিরংসা চরিতার্থ করার বাহন-মাত্র। যদি প্রমাণ করা যায়—আর প্রমাণ করা যায়ও যে এমন কিছু লোক আছে

যাহাদের দেহ সত্যসতই দেবমন্দির, তাহা হইলে অনেকের দুরাচারের জন্য সকলকে নিধন করার কথা বলা চলে না। অনেকে কেন যে দুরাচারী তাহার কারণ অন্যত্র খুঁজিতে হইবে। পাথর-চুন-বালিতে-তৈরী এই সব মন্দির দেহ-দেউলের স্বাভাবিক সম্প্রসারণ ছাড়া আর কিছুই নয়। আর দেহ-দেউলের ছায়ায় এই সব দেবগৃহ নিঃসন্দেহে পরিকল্পিত বলিয়া দেহ-দেউল যে নিয়মবশে জীর্ণ হয় এই সবও সেই নিয়মবশে জীর্ণ হয়।

[হরিজন, ১১-৩-৩৩]

এমন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের কথা আমার জানা নাই দেবগৃহ বলিতে যাহার কিছু ছিল না বা নাই—নাম তাহার যাহাই হোক, মন্দির মসজিদ চার্চ সেনাগগ্ বা আগিয়ারি। আর এ কথাও নিঃসংশয়ে বলা যাইবে না যে বড় বড় ধর্মসংস্কারকদের কেহ—যীশুকে বাদ দিতেছি না—মন্দির একেবারেই ধ্বংস বা পরিহার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সকলেই মন্দির তথা সমাজকে কদাচার হইতে মুক্ত করার প্রযত্ন করিয়াছিলেন। দেখিতে পাই সকলে না হোক তাঁহাদের কেহ কেহ মন্দির হইতে বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। বহু বৎসর যাবৎ আমি মন্দিরে যাই না কিন্তু তাহার ফলে পূর্বাপেক্ষা আমি ভাল হইয়াছি এরূপ আমি মনে করি না। যত দিন চলিতে ফিরিতে পারিতেন আমার মা প্রতিদিন মন্দিরে যাইতেন। আমি মন্দিরে যাই না বটে কিন্তু আমার মনে হয় তাঁহার বিশ্বাস আমার বিশ্বাস হইতে প্রগাঢ় ছিল। এই সব মন্দির গির্জা ও মসজিদ আছে তাই লাখো লাখো লোকের ধর্মবিশ্বাস সঞ্জীবিত আছে। তাহাদের সকলেই ধর্মান্ধ বা ধর্মোন্মাদ নহে। কুসংস্কার ও ধর্মোন্মত্ততা তাহাদের একচেটিয়া বিত্ত নয়। এই সব পাপের জড় রহিয়াছে আমাদের হৃদয় ও মনে।

[হরিজন, ১১-৩-৩৩]

২৬

বৃক্ষ পূজা

কোন পত্র-প্রেরক লিখিতেছেন ঃ—

"এ দেশের স্ত্রী-পুরুষেরা জড় পদার্থের ও বৃক্ষের পূজা করে, এ দৃশ্য প্রায়ই দেখতে পাই। দেশসেবীদের পরিবারের শিক্ষিতা মহিলারা পর্যন্ত এই অভ্যাসের উর্ধ্বে নন দেখে অবাক হতে হয়। এঁদের অনেকে এরূপ পূজা-অনুষ্ঠানের সমর্থনে বলেন যে, প্রকৃতিতে ঈশ্বরের যে বৈভবের প্রকাশ এ তারই প্রতি অনাবিল শ্রদ্ধা-নিবেদন আর তাই এ অন্ধ বিশ্বাস নয়। এই প্রসঙ্গে তাঁরা সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনীর উল্লেখ করে বলেন যে এভাবে তাঁরা তাঁদের স্মৃতি পূজা করেন। এই যুক্তিতে আমি কোন সার খুঁজে পাই না। বিষয়টিতে আলোকপাত করলে বাধিত হব।"

প্রশ্নটি ভাল। মূর্তিপূজা সম্বন্ধে ইহা সেই পুরাতন, অতি পুরাতন প্রশ্নেরই পুনরাবৃত্তি। মূর্তিপূজার সমর্থকও আমি বটি আবার বিরোধীও বটি। মূর্তিপূজা যখন পৌত্তলিকতায় পর্যবসিত হয়, অন্ধ বিশ্বাস ও রীতি-পদ্ধতির বাহন হয়, তখন উহা বিশ্রী সামাজিক কদাচার হইয়া দাঁড়ায় আর তাই উহার বিরোধ করা কর্তব্য হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে মূর্তিপূজা যদি নিজ আদর্শকে সাকার রূপ দেওয়ার প্রয়াস হয় তো বলিব যে তাহা মানুষের সহজাত ধর্ম আর ভক্তির সহায়ক বলিয়া তাহার মূল্যও আছে। উদাহরণস্বরূপ, পবিত্র বা ধর্মগ্রন্থজ্ঞানে কেহ কোন গ্রন্থের পূজা করে তো তাহা মূর্তিপূজাই হইল। শুচি-শুদ্ধ মনে বা ভক্তিভাবে মন্দিরে বা মসজিদে যাই তো মূর্তিপূজাই করি। আর এ সবে কোন হানিও আমি দেখি না। উল্টা, মানুষের জ্ঞান পরিমেয় ও সীমিত বলিয়া ইহা ছাড়া বস্তুত

মানুষের চলেও না। তেমনি, বৃক্ষপূজায় কোন দোষ বা হানি তো আমি দেখিই না, উল্টা তাহাতে দেখি গভীর করুণা ও কাব্যের সুষমা। যে উদ্ভিদ-জগতের অনন্ত অখণ্ড শোভা নানারূপে নানা বেশে কোটি কণ্ঠে বিশ্ব-বিধাতার মহিমা ও বৈভবের জয়গান করিতেছে সেই উদ্ভিদ-জগতের প্রতি হৃদ্‌গত শ্রদ্ধা নিবেদনের ইহা প্রতীক। উদ্ভিদ না থাকিলে আমাদের গ্রহের জীবন এক দিনও চলিত না। অতএব এ দেশের মত বৃক্ষবিরল দেশে বৃক্ষপূজার নিগূঢ় অর্থ নৈতিক তাৎপর্য রহিয়াছে।

অতএব বৃক্ষপূজার বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণার কোন কারণ আমি দেখিতে পাই না। সত্য বটে যে বেচারা শাদাসিধা স্ত্রীলোকেরা বৃক্ষপূজার মর্ম বিচার না করিয়া বৃক্ষপূজা করে আর সে বিচার করার শক্তিও তাহাদের নাই। কেন যে পূজা করে তাহার কারণও সম্ভবত তাহারা দিতে পারিবে না। সরল শুদ্ধ অনাবিল বিশ্বাসভরে তাহারা তাহা করে। এরূপ বিশ্বাস নিন্দনীয় নয়; ইহা অতীব শক্তিমান প্রেরণা, অমূল্য সম্পদ জ্ঞানে যাহা সযত্নে রক্ষা করা কর্তব্য।

গাছের কাছে লোকে মানত করে, কৃপা যাচ্ঞা করে, সে জিনিসটা একেবারেই আলাদা। স্বার্থ-ভাবনা হইতে মানত বা কৃপা যাচ্ঞা করাকে উৎসাহ দিতে নাই, যেখানেই তাহা করা হোক—চার্চে মসজিদে মন্দিরে অথবা বৃক্ষ বা দেউলের সম্মুখে। মূর্তিপূজার সহিত স্বার্থপর যাচ্ঞা বা মানতের কোন কার্য-কারণ সম্বন্ধ নাই। নিজ স্বার্থের জন্য কৃপা যাচ্ঞা মূর্তির কাছেই করি বা নিরাকার ব্রহ্মের কাছে, কথা একই।

কিন্তু ইহা হইতে কেহ যেন অনুমান করিবেন না যে, সাধারণভাবে বৃক্ষপূজা আমি সমর্থন করি। বৃক্ষপূজা ভক্তির অপরিহার্য অঙ্গ, এই ভাবনা হইতে বৃক্ষপূজা সমর্থন করিতেছি না, করিতেছি

শুদ্ধ এই ভাবনা হইতে যে, ভগবান অগণিত রূপে এই বিশ্বে ব্যক্ত রহিয়াছেন। আর তাঁর যে কোন অভিব্যক্তির কাছে আমার মাথা স্বতঃই শ্রদ্ধায় নত হয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৬-৯-২৯]

২৭

বিচার ও বিশ্বাস

বিচারের (বুদ্ধির) সীমা স্পষ্টত সীমিত। অভিজ্ঞতার হোঁচট খাইয়া এই কথা আমি শিখিয়াছি। স্থানচ্যুত হইলে বস্তু যেমন জঞ্জাল হয়, অপব্যবহারে বুদ্ধি তেমনি বাতুলতায় পর্যবসিত হয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৪-১০-২৬]

যুক্তিবাদীরা খুবই ভাল লোক কিন্তু যুক্তিবাদ যখন সর্বশক্তিমত্তার দাবি করে তখন তাহা হয় কিম্ভূতকিমাকার বস্তু। বুদ্ধিতে সর্বশক্তি-মত্তা আরোপ করা জড় পদার্থকে ভগবান জ্ঞানে পূজা করার মতই পৌত্তলিকতা। বুদ্ধিকে দাবানোর কথা বলি না, বলি অন্তর্নিহিত যে সত্তা বুদ্ধিকে শুচি-শুদ্ধ করে তাহাকে তাহার প্রাপ্য মর্যাদা দিতে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৪-১০-২৬]

এমন কতকগুলি বিষয় আছে যেখানে বুদ্ধি (বিচার) আমাদের বেশী দূর লইয়া যাইতে অক্ষম আর সেখানে বিশ্বাসের শরণ লইতে হয়। বিশ্বাস সে ক্ষেত্রে বিচারকে খণ্ডন করে না, করে অতিক্রম। বিশ্বাসকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলা যাইতে পারে, বুদ্ধির অতীত বিষয়ে তাহা আমাদের আশ্রয়।

[হরিজন, ৬-৩-৩৭]

বাত্যাবিক্ষুব্ধ সাগরে বিশ্বাস কাণ্ডারী, উত্তুঙ্গ পর্বত লঙ্ঘনে বিশ্বাস সমর্থ যষ্টি। মহাসাগর অতিক্রমণে বিশ্বাস নির্ভয় পোত। ভগবান অন্তরে বিরাজমান এই জ্বলন্ত জাগ্রত উপলব্ধি বই ওই বিশ্বাস আর কিছু নয়। এই প্রত্যয় যাহার জন্মিয়াছে তাহার পাইতে কিছুই বাকি নাই। দেহ তাহার রোগজীর্ণ হইতে পারে কিন্তু আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যে সে বলবান; পার্থিব সম্পদে গরীব হইলেও আধ্যাত্মিক সম্পদে সে কুবের।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৪-৯-২৫]

বিশ্বাস গিয়াছে তো দুনিয়া ছারখার হইয়াছে। প্রার্থনা ও তপ প্রভাবে যাঁহারা শুচি-শুদ্ধ জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন বলিয়া জানি, তাঁহাদের বিচারসিদ্ধ অভিজ্ঞতা আত্মসাৎ করিয়া লওয়াই প্রকৃত বিশ্বাস। অতএব অতীতে যুগে যুগে যে সকল প্রেরিত-পুরুষ ও অবতারের আবির্ভাব হইয়াছে সেই অবতারে বিশ্বাস অন্ধ কুসংস্কার নয়, পক্ষান্তরে নিগূঢ় আধ্যাত্মিক আকিঞ্চনের তাহা পরিতৃপ্তি।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৪-৪-২৭]

ভগবানে বিশ্বাস সকলেই করে যদিও সে বিষয়ে সকলে সজ্ঞান নহে। কারণ আত্মপ্রত্যয় যে কোন লোকের আছে আর ওই আত্মপ্রত্যয়কে যত পার গুণ কর তো হইল ভগবান। জীবের সমষ্টিই ভগবান। ভগবান আমরা না হইতে পারি কিন্তু ভগবানের অংশ তো আমরা বটেই, যেমন ক্ষুদ্র জলবিন্দু মহাসাগরেরই অংশ। ধরুন, মহাসাগর হইতে ওই জলবিন্দু কোটি মাইল দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে; নিজ পরিবেশ হইতে ছিন্ন বলিয়া উহা মহাসাগরের শক্তি ও ঐশ্বর্য বোধ-রহিত আর তাই অসহায়। মহাসাগরেরই উহা অংশ এই বোধ যদি কেহ তাকে ফিরাইয়া দেয় তো উহার শক্তি সে

ফিরিয়া পাইবে, আনন্দে নাচিবে আর সমগ্র সাগরের শক্তি ও বৈভব উহাতে প্রতিবিম্বিত হইবে।

[হরিজন, ৩-৬-৩৯]

বাহ্য প্রকাশ না থাকিলেও মায়ের স্নেহের পরশ শিশু অনুভব করে, তদ্রূপ ভগবান হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন এই বোধ জন্মিলে হয় তাঁর সাক্ষাৎ দর্শন লাভ। মায়ের ভালবাসার অস্তিত্ব শিশু কি যুক্তি দিয়া সপ্রমাণ করে? অন্যের কাছে তাহা কি সে প্রমাণ করিতে পারে? সগৌরবে সে বলে 'তা আছে'। ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও ঠিক ওই কথা। তাহা প্রমাণ করার উপায় নাই। কিন্তু অনুভব করা যায়। তুলসীদাস চৈতন্য রামদাস ও অন্য অনেক আধ্যাত্মিক গুরুদের অভিজ্ঞতা যেন আমরা অগ্রাহ্য না করি, যেমন অগ্রাহ্য করি না বৈষয়িক উপদেষ্টাদের অভিজ্ঞতা।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৯-৭-২৫]

২৮

ধর্মগ্রন্থ

শ্রীবেসিল ম্যাথুস্ : আপনার প্রভাবের উৎস কোথায় ?

গান্ধীজী : (বুকের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) এখানে। যে কোন ধর্মগ্রন্থকে, এমনকি গীতাকেও বিচারের কষ্টিপাথরে আমি যাচাই করে নিই। শাস্ত্রবচনকে বিচারের ঊর্ধ্বে স্থান দিতে পারি না। প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থ ঈশ্বরানুপ্রাণিত এ কথা স্বীকার করি। তবে দ্বিবিধ পরিস্রাবণ ক্রিয়ার ভিতর দিয়ে তারা এসেছে : এক —নরদেহী ধর্মপ্রবর্তকদের মুখে তা বিবৃত আর দুই—ভাষ্যকারদের দ্বারা তা বিশ্লেষিত। এ সবের কোন কথাই সরাসরি ভগবানের কাছ থেকে আসে নি। ম্যাথু কোন বচনের এক পাঠ দিয়েছেন তো জন দিয়েছেন অন্য এক। অনুপ্রাণিত বলেই নির্বিচারে গ্রহণ করতে হবে এ কথা আমি মানি না। তা ছাড়া সর্বোপরি মনে রাখতে হবে 'অক্ষরে তরায় না, তরায় ভাবে।' কিন্তু আমায় ভুল বুঝবেন না। যেসব ব্যাপার, (যেমন ভগবানের অস্তিত্ব) বুদ্ধির অতীত, সেখানে আমি বিশ্বাসের শরণ নিই। কোন যুক্তির সাধ্য নাই সেই বিশ্বাস থেকে আমায় টলায়। আর সকল যুক্তি ঠেলে ফেলে সেই ছোট্ট মেয়েটি যেমন বারংবার বলেছিল 'তবুও আমরা সাত', তেমনি অতীব তীক্ষ্ণধী ব্যক্তির নিকট যুক্তিতে পরাভূত হলেও বারংবার বলব, 'তবুও ভগবান আছেন।'

[হরিজন, ৫-১২-৩৬]

ঈশ্বরজ্ঞান বই হইতে মিলে না। নিজ অন্তরে তাহা উপলব্ধি করিতে হয়। বড়জোর বই সহায় মাত্র, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বই অন্তরায়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৭-৭-২৪]

শত প্রচারেও মিথ্যা সত্য হয় না আর কেহ দেখে না বলিয়াও সত্য মিথ্যা হয় না।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৬-২-২৫]

যে প্রমাণ ধীর-স্থির বিচারের কাঁচিতে কাটা যায়, যে প্রমাণ হৃদয়ের অনুশাসনের উল্টা কথা বলে, সে প্রমাণকে আমি প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করি না। যে প্রমাণ বিচার-সিদ্ধ তাহা দুর্বলকে সবল করে, উন্নত করে। কিন্তু যে প্রমাণ বিবেকানুমোদিত বিচারকে উড়াইয়া দেয় সে প্রমাণ পতনের বাহন হয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৮-১২-২০]

অক্ষর-বিচারী আমি নহি। তাই জগতের বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম বুঝিতে আমি চেষ্টা করি। এই সকল ধর্মগ্রন্থে সত্য ও অহিংসার যে অনুশাসন আছে সেই সত্য ও অহিংসার কষ্টিপাথরেই আমি উহাদের বিচার করি। এই পরীক্ষায় উতরায় তো সাদরে গ্রহণ করি, নয় তো অগ্রাহ্য করি। বেদ অধ্যয়ন করার ধৃষ্টতা করিয়াছিল বলিয়া কোন শূদ্রকে রাম বধ করিয়াছিলেন এ কথা আমি প্রক্ষিপ্ত মনে করি। সে যাহা হোক, ঐতিহাসিক আবিষ্ক্রিয়া ও গবেষণার প্রগতির ফলে যে রামের জীবন-বৃত্তান্ত বদলাইতে পারে সেই ঐতিহাসিক রামের উপাসনা আমি করি না, করি পূর্ণ নিখুঁত রামের। তুলসীদাসের রাম ঐতিহাসিক রাম নয়। ইতিহাসের দৃষ্টিতে দেখিলে তাঁহার রামায়ণ অপদার্থ বলিয়া পরিত্যাজ্য। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ভাণ্ডার হিসাবে এই গ্রন্থ প্রায় অতুলনীয়। অন্তত আমার কাছে তো বটেই। তথাপি তুলসীদাসের রামায়ণ বলিয়া প্রকাশিত নানা সংস্করণে যে সব কথা আছে তাহার সব কিছু আমি মানি না। এই বইয়ের অন্তর্নিহিত ভাবে আমি মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া যাই।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৭-৮-২৫]

মহাভারতের কৃষ্ণ কোন দিন ছিলেন কিনা জানি না। আমি যে কৃষ্ণের কথা বলি সে কৃষ্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি নহেন। অভিমানে আঘাত লাগিলে যে কৃষ্ণ লোক হনন করে, অহিন্দুরা যে কৃষ্ণকে লম্পট বলিয়া চিত্রিত করে, আমি সেই কৃষ্ণের পূজা কস্মিনকালেও করি না। আমার কল্পনার কৃষ্ণ পূর্ণ অবতার, নিষ্কলঙ্ক বলিতে যাহা বুঝায় তিনি তাহাই, গীতার অনুপ্রেরক, কোটি হৃদয়ের প্রেরণা-দাতা। আধুনিক ঐতিহাসিক গ্রন্থের মতই মহাভারত ঐতিহাসিক গ্রন্থ, মহাভারতের প্রতিটি কথা প্রামাণ্য এবং যেসব কর্ম কৃষ্ণের উপর আরোপ করা হয় তাহার কোন কোন কর্ম তিনি করিয়াছিলেন এ কথা যদি সপ্রমাণ হয় তবে সেই কৃষ্ণকে আমি ভগবানের অবতার বলিয়া মানিব না, সে জন্য হিন্দুধর্ম আমাকে বহিষ্কার করে তো করুক। কিন্তু আমি মহাভারতকে মহাধর্মগ্রন্থ বলিয়া মানি। বহুলাংশে উহা রূপক, কোনমতেই ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত নয়। আমাদের অন্তরে যে চিরদ্বন্দ্ব চলিতেছে তাহারই উহা বর্ণনা। সে চিত্র এমন জ্বলন্ত যে পাঠকালে মনে হয় উহাতে বর্ণিত ব্যাপার সত্যই মনুষ্য কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আর আজ যে রূপে মহাভারত আমরা পাইয়াছি তাহা মূলের নিখুঁত প্রতিলিপি এ কথাও আমি মনে করি না। পক্ষান্তরে মনে করি উহার অনেক অদলবদল হইয়াছে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১-১০-২৫]

ভক্তিভাবে পঠন-মনন ও উপলব্ধি ব্যতীত শাস্ত্রার্থের সঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না। বেদপাঠে শূদ্রের অধিকার নাই এ কথা একেবারে অর্থহীন নয়। শূদ্র মানে আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিবিহীন অজ্ঞ লোক। এমন লোকের পক্ষে বেদ-বেদাঙ্গের অপব্যাখ্যা করাই অধিক সম্ভব। বীজ-গণিতের সমীকরণের সমাধান যে-কেহ করিতে পারে না।

তাহার জন্য কিছুটা পূর্বানুশীলন একান্ত আবশ্যক। 'আমি ব্রাহ্মণ' এই মহা সত্য কি পাপাচারীর মুখে কখনও শোভা পায়! কে জানে কত দুষ্কৃতির জন্য সে উহার ব্যবহার করিবে! কতই না তাহার হাতে উহা বিকৃত হইবে!

অতএব যে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিবে তাহাকে আগে অধ্যাত্মের অনুশীলন করিতে হইবে, যম-নিয়ম আদি শাশ্বত ব্রতের অভ্যাস করিতে হইবে। অভিনয় নয়, গভীর অনুশীলন চাই। শাস্ত্রে গুরুর আবশ্যকতার কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু আজকাল গুরু মেলা দুষ্কর। তাই সাধুসন্তেরা আধুনিক ভক্তিগ্রন্থের আশ্রয় লইতে বলিয়াছেন। ভক্তিহীন বিশ্বাসহীন লোকের শাস্ত্র-ব্যাখ্যার অধিকার নাই। পণ্ডিত ব্যক্তিরা শাস্ত্রের বিশদ ব্যাখ্যা করিতে পারেন কিন্তু তাহা ঠিক ব্যাখ্যা হইবে না। উপলব্ধিপরায়ণ ব্যক্তিই কেবল যথার্থ ব্যাখ্যা করার অধিকারী।

কিন্তু অনভিজ্ঞ লোকদের পথ প্রদর্শনের জন্যও কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আছে। যে ব্যাখ্যা সত্যের বিরোধী তাহা অঠিক। সত্যে যাহার বিশ্বাস নাই তাহার কাছে শাস্ত্রের মূল্য নাই। তাহার সঙ্গে পারিয়া ওঠার উপায় নাই।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১২-১১-২৫]

২৯

গীতার উপদেশ

১। গীতা প্রথমে আমি পড়ি ১৮৮৮-৮৯ সনে। তখনই আমি বুঝিয়াছিলাম যে গীতা ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা করে নাই, করিয়াছে ভৌতিক যুদ্ধের অছিলায় মানবমনে যে চিরযুদ্ধ চলিতেছে সেই যুদ্ধের। আর অন্তরের ঐ দ্বন্দ্বের বর্ণনা চিত্তাকর্ষক করার জন্য ভৌতিক যুদ্ধের অবতারণা করিয়াছে। ধর্মের ও গীতার গভীরতর অধ্যয়নের ফলে এই প্রাথমিক অনুভব আমার অধিক দৃঢ় হয়। মহাভারত অধ্যয়ন করার পরে এই অনুভব আরও বেশী সুনিশ্চিত হয়। ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিতে যাহা বুঝায়, আমার মতে মহাভারত সেরূপ ইতিহাস-গ্রন্থ নয়। আমার এই কথার নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায় আদি পর্বে। প্রধান প্রধান চরিত্রের অতিমানব বা অ-মানব জন্মের কথা বলিয়া মহামুনি ব্যাস তাঁহার চিত্রিত রাজা-প্রজাদের ঐতিহাসিক পটভূমি উড়াইয়া দিয়াছেন। এই সব চরিত্র ইতিহাসের মানুষ হইতে পারে কিন্তু মহাভারতকার তাহাদের ব্যবহার করিয়াছেন স্বীয় ধর্মাখ্যান লোকমনে গাঁথিয়া দেওয়ার নিমিত্ত।

২। মহাভারতকার ভৌতিক যুদ্ধের আবশ্যকতা সিদ্ধ করেন নাই। উহার ব্যর্থতার কথাই সপ্রমাণ করিয়াছেন। বিজয়ীদের তিনি দুঃখে মনস্তাপে কাঁদাইয়াছেন; তাহাদের জন্য বিবিধ যাতনা ব্যতীত আর কিছু রাখেন নাই।

৩। গীতা এই মহীরুহ-সদৃশ মহাগ্রন্থের মহান্ ফল। ইহার দ্বিতীয় অধ্যায় ভৌতিক যুদ্ধের নিয়ম শিখায় না, শিখায় স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিকে চিনিবার উপায়। স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণাদির মধ্যে ভৌতিক যুদ্ধের অনুরূপ কোন প্রমাণ আমি দেখিতে পাই না। যুধ্যমান

পক্ষদ্বয়ের যুদ্ধের আচরণবিধি মানিয়া চলিতে হয়। গীতার পূর্বাপর বিন্যাস তদনুরূপ নহে, একেবারে তদ্বিপরীত।

৪। গীতার কৃষ্ণ পূর্ণ ব্রহ্ম, মূর্তিমান পরম জ্ঞান কিন্তু কল্পিত। তাহা বলিয়া কৃষ্ণ লোকের হৃদয়-দেবতা ছিলেন না তাহা নয়। কিন্তু পূর্ণতা কল্পিত। পূর্ণ-অবতারের ভাবনা পরে আরোপিত হইয়াছে।

৫। কোন ব্যক্তি মানবের অতি মহান্ সেবা করিলে হিন্দুধর্ম তাঁহাকে অবতার বলিয়া মানে। বস্তুত দেহধারীমাত্রেই ভগবানের অবতার, তবু যে-কেহকে অবতার মানা হয় না। কোন ব্যক্তি অসাধারণ ভাগবত জীবন যাপন করিয়া যান তো পরবর্তী কালের লোকেরা তাঁহার প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। এই ক্রিয়াতে আমি কোন অসঙ্গতি দেখি না, ঈশ্বরের ঐশ্বর্য তাহাতে কমে না আর সত্যও আহত হয় না। একটি উর্দু বচনে বলা হইয়াছে, 'আদম ঈশ্বর নন, ঈশ্বরের ফুলকি'। সুতরাং নিরতিশয় ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি অশেষ ঐশ্বরিক বিভূতির অনেকটা অধিকারী। এই ভাবনা হেতু কৃষ্ণ হিন্দুধর্মে পূর্ণ অবতারের পদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৬। অবতারে বিশ্বাস মানুষের মহৎ উচ্চাকাঙ্ক্ষার দ্যোতক। ভগবানের মত না হওয়া পর্যন্ত মানুষের সোয়াস্তি নাই। এই অবস্থায় পৌঁছানোর আকূতি মানুষের অন্তিম লক্ষ্য। আর এরই নাম আত্মোপলব্ধি। এই আত্মোপলব্ধিই গীতার প্রতিপাদ্য। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থেরও ইহাই প্রতিপাদ্য। কিন্তু গীতার রচয়িতা ওই মত প্রতিপাদনের জন্য গীতা লিখেন নাই। আমার মনে হয় আত্মোপলব্ধির প্রকৃষ্টতম পন্থা নির্দেশের নিমিত্তই গীতা রচিত। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের এখানে সেখানে অল্পাধিক স্পষ্টভাবে যাহা ছড়ানো আছে, গীতা সে সব যারপরনাই প্রাঞ্জল ভাষায় এক জায়গায় ধরিয়াছে আর সে জন্য পুনরুক্তিও ঘটিয়াছে।

৭। কর্মফলত্যাগ সেই অতুলনীয় পন্থা।

৮। এই সূত্রেই গীতা-মালা গ্রথিত। কর্মফলত্যাগ এই সৌর-জগতের সূর্য আর ভক্তি-কর্ম-জ্ঞানরূপ নানা গ্রহ উহার চতুর্দিকে ঘূর্ণ্যমান। দেহ কারাগার সদৃশ। দেহ আছে তো কর্ম আছে। দেহধারী কোন জীবের কর্ম হইতে নিষ্কৃতি নাই। তাহা হইলেও সকল ধর্মেই বলে, এই দেহকে ভগবানের মন্দিররূপে ব্যবহার করিলে মানুষ মোক্ষ লাভ করিতে পারে। তুচ্ছাতিতুচ্ছ কর্মও সদোষ। দেহকে ভগবানের দেউল কি করিয়া করা যায়? অন্যকথায়, মানুষের কর্ম হইতে অর্থাৎ পাপের ছোঁয়াচ হইতে মুক্তি পাওয়ার উপায় কি? একান্ত স্পষ্ট কথায় গীতা এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছে—"নিস্পৃহ কর্মদ্বারা কর্মফল ত্যাগ করে, সর্বকর্ম বাসুদেবকে সমর্পণ করে, আত্মসমর্পণ করে।"

৯। কিন্তু নিস্পৃহতা বা সমর্পণভাব মুখের কথায় আসে না। আর পাণ্ডিত্যের ভেল্‌কির দ্বারাও তাহা পাওয়া যায় না। নিরন্তর হৃদয়-মন্থনের দ্বারা তাহা লাভ হয়। ত্যাগের জন্য যথার্থ জ্ঞান দরকার। পণ্ডিতদের জ্ঞান এক ধরনের। কণ্ঠস্থ বেদ তাহারা আবৃত্তি করিবে; ওদিকে হয়তো ভোগময় জীবন যাপন করে। জ্ঞান সংযম-রহিত না হয়, উচ্ছৃঙ্খল না হয় তাই গীতা জোর দিয়া বলিয়াছে যে জ্ঞান ভক্তিময় হওয়া চাই। ভক্তিকে প্রথম স্থান দেওয়া হইয়াছে। ভক্তিহীন জ্ঞান বর্ষণ-রহিত গর্জন। গীতা বলিয়াছে, "শ্রদ্ধার উদয় হয় তো জ্ঞানের উদয় হয়।" বাচনিক পূজা শ্রদ্ধা নয়; শ্রদ্ধা মানে মৃত্যুদূতরূপ প্রলোভনকে কঠোর সংগ্রামে পরাভূত করা। তাই গীতার ভক্ত-লক্ষণ মুনি-ঋষি বর্ণিত ভক্ত-লক্ষণেরই অনুরূপ।

১০। তাই গীতা যে ভক্তির কথা বলে তাহা ভাবাবেশের উচ্ছ্বাস নয়। অন্ধ বিশ্বাস তো নয়ই। গীতার ভক্তিতে বাহ্যানুষ্ঠানের স্থান প্রায় নাই। ভক্ত ইচ্ছা করিলে মালা জপিতে পারে, তিলক সেবা করিতে পারে, পূজা করিতে পারে কিন্তু তাহার ভক্তির পরীক্ষা

এসবে নয়। যাহার কাহারও প্রতি দ্বেষ নাই, হৃদয় যাহার করুণায় ভরা, যে নিরহংকার, স্বার্থলেশহীন, শীতোষ্ণ সুখদুঃখ যাহার কাছে সমান, যে ক্ষমাশীল, যে সদাসন্তুষ্ট, যে দৃঢ়নিশ্চয়, যে মন ও বুদ্ধি ভগবানে সমর্পণ করিয়াছে, যে উত্যক্ত করে না, উত্যক্ত হয় না, যে হর্ষ দুঃখ সুখ ও ভয় হইতে মুক্ত, যে পবিত্র, যে কর্মদক্ষ অথচ আসক্তিরহিত, যে ভাল মন্দ সব কিছু ত্যাগ করে, শত্রুমিত্রের প্রতি যে সমভাব, মান-অপমান যে গায়ে মাখে না, নিন্দাস্তুতিতে যে নির্বিকার, যে মৌনী, একান্তে থাকিতে যে ভালবাসে, যে স্থিরমতি, সে ভক্ত। এরূপ ভক্তি ও প্রবল আসক্তি এই দুইয়ের একত্র সমাবেশ হইতে পারে না।

১১। তবেই দেখা যাইতেছে যে, আত্মোপলব্ধি বিনা প্রকৃত ভক্ত হওয়া যায় না। আত্মোপলব্ধি পৃথক্ বস্তু নয়। টাকা দিয়া আমরা বিষও কিনিতে পারি, অমৃতও কিনিতে পারি। কিন্তু জ্ঞান বা ভক্তি দিয়া মুক্তি বা বন্ধন কেনা যায় না। জ্ঞান-ভক্তি বিনিময়ের সিক্কা নয়। এসব স্বয়ং আমাদের কাম্য বস্তু। অন্য কথায়, উপায় ও উদ্দেশ্য এক না হইলেও প্রায় এক। উপায়ের অন্তে মুক্তি অপেক্ষমাণ। গীতার মোক্ষ মানে পূর্ণ শান্তি।

১২। কিন্তু কর্মফলত্যাগের যাচাইতে উতরাইলে তবেই ওই জ্ঞান ও ভক্তিকে প্রকৃত জ্ঞান ও ভক্তি বলা যাইবে। কেবল ন্যায়-অন্যায়ের জ্ঞানে মোক্ষ মিলিবার নয়। কেহ খুব পড়াশোনা করিয়াছে তো হইল পণ্ডিত এমন একটা ধারণা সাধারণের আছে। তাহার কর্ম করার, সেবা করার দরকার নাই। ছোট্ট ঘটিটা তোলাও তাহার দৃষ্টিতে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। কর্ম করার দায়িত্ব না থাকাই যেখানে জ্ঞানের একমাত্র পরীক্ষা সেখানে ঘটি-তোলার মত পার্থিব কর্মের স্থান কোথায়!

১৩। অথবা ভক্তির কথা ধরুন। ভক্তি অর্থে সাধারণত লোকে

বোঝে হৃদয়ের কোমলতা, মালা-ফেরানো ইত্যাদি এবং দয়াকার্যে পর্যন্ত ঔদাসীন্য—পাছে তাহাতে মালা জপার ব্যাঘাত ঘটে। তাই এই ভক্ত জপমালা ত্যাগ করে তো করে আহার-পান ইত্যাদির জন্য, গমভাঙ্গা বা রোগী-সেবার জন্য কস্মিনকালেও নয়।

১৪। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, "কর্ম ছাড়া কেউ সিদ্ধি লাভ করে নি। এমন যে জনক তাঁরও কর্ম করে সিদ্ধি লাভ করতে হয়েছিল। আলস্য থেকে আমি যদি কর্মে বিরত হই তবে বিশ্ব ধ্বংস হবে। তা হলে লোকসাধারণের কর্ম করা কত অধিক প্রয়োজন!"

১৫। কর্ম বন্ধনের হেতু এ কথা যেমন সত্য তেমনি অন্যদিকে এ কথাও সত্য যে প্রাণীমাত্রকেই ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় এটা-সেটা নানা কর্ম করিতে হয়। কর্ম বলিতে এখানে মানসিক ও দৈহিক সর্ব কর্ম বুঝিতে হইবে। মানুষের যখন কর্ম না করিয়া উপায় নাই তখন কর্ম-বন্ধনের হাত হইতে তাহার মুক্তির উপায়? গীতা যে ভাবে এই প্রশ্নের সমাধান করিয়াছে আমার মতে তাহা অপূর্ব। গীতা বলেঃ "তোমার নিয়ত কর্ম তুমি কর কিন্তু তার ফল ত্যাগ কর—নির্লিপ্ত হও ও কর্ম কর—ফলে আসক্তি না রেখে কর্ম কর।"

ইহাই গীতার সুস্পষ্ট শিক্ষা। যে কর্মত্যাগ করে সে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যে কর্মফল ত্যাগ করে সে মোক্ষ পায়। কর্মফল ত্যাগ করার অর্থ ফল সম্বন্ধে ঔদাসীন্য নয়। কোন্ কর্মের কি ফল হইতে পারে আর সেই কর্ম করার শক্তি আছে কিনা এ কথা বুঝা চাই। এ ভাবে যে প্রস্তুত হয়, ফলের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া একাগ্র চিত্তে নিজ কর্ম করিয়া যায়, সে কর্মফল ত্যাগ করিয়াছে বলা যাইবে।

১৬। তাহা ছাড়া, এ কথা যেন কেহ মনে করিবেন না যে ফলত্যাগকারী ফল পাইবে না। গীতা এ কথা বলে না। ত্যাগ মানে ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখা। বস্তুত যে ত্যাগ করে সে সহস্রগুণ পায়। গীতার ফলত্যাগে বিশ্বাসের চরম পরীক্ষা হয়। যে অনুক্ষণ

ফলের কথা ভাবে কর্তব্যকর্মে তাহার তন্ময়তা থাকে না। সে অধৈর্য হয়, ক্রুদ্ধ হয়, আর নানা অকরণীয় কর্ম করিতে থাকে; এ কাজ ধরে তো ও কাজ ছাড়ে—কোন কর্মেই তাহার মন বসে না। ফলের দিকে যাহার নজর সে ইন্দ্রিয়াসক্ত লোকের ন্যায়; সে সদা বিক্ষিপ্ত, সমস্ত সংকোচ তাহার লোপ পায়; তাহার দৃষ্টিতে সব কিছুই ন্যায়সঙ্গত আর তাই উদ্দেশ্য প্রাপ্তির জন্য সে ভালমন্দ সব রকম উপায় অবলম্বন করে।

১৭। ফলাকাঙ্ক্ষার তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে গীতার রচয়িতা ফলত্যাগরূপ পথের খোঁজ পান এবং লোকসমক্ষে অতীব হৃদয়গ্রাহী ভাষায় তাহা ধরেন। লোকে সাধারণত মনে করে যে জাগতিক কাম্যের সহিত ধর্মের চির বিরোধ। ব্যবহায়িক লোককে বলিতে শোনা যায়, "ধর্মের পথে চ'লে ব্যবসা-বাণিজ্য চলে না; এ সব ক্ষেত্রে ধর্মের স্থান নাই; ধর্ম কেবল মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য।" আমি মনে করি গীতাকার এই ভুল ধারণা দূর করিয়াছেন। মোক্ষ ও ইহজাগতিক ব্যাপারের মধ্যে তিনি কোন ভেদরেখা টানেন নাই। উল্টা তিনি দেখাইয়াছেন যে, আমাদের সকল জীবনকর্ম ধর্মশাসিত হওয়া চাই। দৈনন্দিন জীবন-ব্যাপারে যে ধর্ম আচরণ করা যায় না তাহা ধর্ম নহে, আমি অনুভব করি, ইহাই গীতার শিক্ষা। অতএব যে কার্য অনাসক্ত-ভাবে করা যায় না, গীতার মতে, তাহা ত্যাজ্য। এই অমূল্য নিয়ম মানিয়া চলিলে নানা অতর্কিত বিপদ হইতে লোকে রক্ষা পাইতে পারে। এই ব্যাখ্যা অনুসারে নরহত্যা, মিথ্যাকথন, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা দুষ্কর্ম অতএব ত্যাজ্য কর্ম বলিয়া গণ্য হইবে। সে স্থলে মানুষের জীবন সরল সহজ স্বাভাবিক হয় আর স্বাভাবিকতা হইতে সন্তোষ জন্মে।

১৮। এরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমার মনে হইয়াছে যে, গীতার মূল শিক্ষা অনুযায়ী জীবন যাপন করিতে হইলে সত্য ও অহিংসার শরণ লওয়া ছাড়া উপায় নাই। ফলাকাঙ্ক্ষা যদি না থাকিত তবে

অসত্য ও হিংসার আশ্রয় লওয়ার প্রলোভন থাকিত না। যে কোন অসত্য বা হিংসার কথা ধরুন, দেখিতে পাইবেন মূলে রহিয়াছে কাম্য উদ্দেশ্য সিদ্ধির বাসনা। কিন্তু এ কথা নিঃসংকোচে বলা যাইতে পারে যে, অহিংসার প্রতিষ্ঠার জন্য গীতা লেখা হয় নাই। গীতার পূর্ববর্তী কালেই অহিংসা মৌলিক ধর্ম বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। কর্মফলত্যাগের কথা শোনানো ছিল গীতার লক্ষ্য। সে কথা প্রারম্ভে দ্বিতীয় অধ্যায়েই বলা হইয়াছে।

১৯। কিন্তু গীতা যদি অহিংসায়ই বিশ্বাস করিবে অথবা অহিংসা যদি অনাসক্তির অঙ্গই হইবে তবে যুদ্ধের উদাহরণ লওয়া হইল কেন? গীতার রচনা কালে যদিও লোকে অহিংসায় বিশ্বাস করিত তবুও যুদ্ধ তখনও নিষিদ্ধ হয় নাই আর লোকে যুদ্ধ-বিগ্রহের ও অহিংসার মধ্যে কোন বিরোধও দেখিত না।

২০। ফলত্যাগের মূল্য নিরূপণ প্রসঙ্গে গীতাকার অহিংসাগুণকে গৌণ স্থান দিলেন কেন ইত্যাদি প্রশ্নের সূক্ষ্ম বিচার নিষ্প্রয়োজন। কোন কবি জগতবাসীর কাছে কোন সত্য ধরিয়াছেন বলিয়াই যে তিনি তৎসম্বন্ধে সব কিছু জানিয়াছেন বা উহার মহান্ পরিণামের কথা ভাবিয়া দেখিয়াছেন বা ভাবিয়া দেখিলেও সব সময় তাহা পুরাপুরি ব্যক্ত করিতে পারিবেন এ কথা বলা চলে না। এখানেই সম্ভবত কাব্যের ও কবির শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত। কবির অর্থের শেষ নাই, সীমা নাই। মানুষের যেমন শ্রেষ্ঠ রচনারও তেমন ক্রমাভিব্যক্তি হয়। ভাষার ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, অর্থগর্ভ শব্দের তাৎপর্য পরিবর্তিত বা প্রসারিত হইয়াছে। গীতা সম্বন্ধে এ কথা প্রযোজ্য। রচয়িতা নিজেই কতকগুলি প্রচলিত শব্দের অর্থ সম্প্রসারণ করিয়াছেন। উপর-উপর দেখিলেও তাহা আমাদের কাছে ধরা পড়ে। সম্ভবত গীতার পূর্ববর্তী কালে পশুবলি বিহিত ছিল। কিন্তু গীতার বলি বা স্যাক্রিফাইসে সেই বলিদানের নামগন্ধও মিলে না। গীতোক্ত বলি

বা সমর্পণের পরাকাষ্ঠা নিরন্তর ভাগবত সমাধিতে। ত্যাগ বা বলি বলিতে প্রধানত লোকহিতার্থে কর্ম করা বুঝিতে হইবে, মনে হয়, তৃতীয় অধ্যায় এ কথাই প্রতিপন্ন করিয়াছে। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় এক যোগে পড়িলে বলির বা সমর্পণের অন্য অর্থ পাওয়া যাইবে। কিন্তু পশুবলির কথা আদৌ তাহাতে নাই। তদ্রূপ, 'সন্ন্যাসী' শব্দ গীতায় রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে। গীতার সন্ন্যাস সকল কর্মের ন্যাস নয়। গীতার সন্ন্যাস নিরন্তর কর্ম, অথচ অ-কর্ম। এভাবে গীতাকার শব্দের অর্থ সম্প্রসারণ করিয়া আমাদিগকে তাঁহার অনুগমন করিতে শিখাইয়াছেন। গীতার আক্ষরিক ব্যাখ্যা করিলে যুদ্ধের সহিত সম্ভবত ফলত্যাগের বিরোধ দেখা যাইবে না, এ কথা না হয় স্বীকার করা যাইতেছে। কিন্তু সবিনয়ে আমি বলিব যে, চল্লিশ বছর গীতার শিক্ষানুযায়ী জীবন যাপন করার নিরন্তর চেষ্টা করিয়া আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে সর্বভাবে ও সর্বরূপে অহিংস না হইলে পূর্ণ ফলত্যাগ—আত্মসমর্পণ করা যায় না।

২১। গীতা মন্ত্রগ্রন্থ নয়, গীতা মহান্ ধর্মগ্রন্থ। ইহার যত গভীরে ডুবিবে তত মহদর্থ পাইবে। সাধারণের জন্য রচিত বলিয়া ইহাতে পুনরুক্তি আছে কিন্তু সেই পুনরুক্তি দিব্য মধুর। যুগে যুগে ইহার মহৎ শব্দসমূহে লোকে নব নব অর্থ পাইবে। উহাদের অর্থ সম্প্রসারিত হইতে থাকিবে। কিন্তু ইহার মূল শিক্ষা অপরিবর্তিত থাকিবে। গীতার মূল শিক্ষানুযায়ী জীবনগতির মোড় ফিরাইবার নিমিত্ত সাধক এই খনি হইতে ইচ্ছামত অনুকূল অর্থ অবাধে নিষ্কাশন করিতে পারে।

২২। ইহা কর, উহা করিও না এইরূপ বিধি-নিষেধের সংকলনও গীতা নয়। একের পক্ষে যাহা ন্যায় অন্যের পক্ষে তাহা অন্যায় হইতে পারে। এক সময়ে বা এক জায়গায় যাহা করণীয়, অন্য সময়ে বা অন্য জায়গায় তাহা অকরণীয়। কেবল ফলাকাঙ্ক্ষা সর্বথা নিষিদ্ধ। অনাসক্তি অপরিহার্য।

২৩। গীতা জ্ঞানের মহিমা কীর্তন করিয়াছে কিন্তু জ্ঞান শুষ্ক পাণ্ডিত্যের নাগালের বাহিরে, আসলে তাহা হৃদয়ের বস্তু আর হৃদয় দিয়াই তাহা বুঝিতে হয়। অতএব গীতা বিশ্বাসহীনের জন্য নয়। গীতাকার কৃষ্ণকে দিয়া বলাইতেছেন :

"যে তপস্বী নয়, ভক্ত নয়, শুনতে ইচ্ছুক নয় ও যে আমাকে দ্বেষ করে তাকে এই দিব্য জ্ঞান দিও না। পরন্তু এই পরম গুহ্য-জ্ঞান আমার ভক্তকে দেবে। পরম ভক্তি করার হেতু সে আমাকে নিঃসন্দেহ পাবে। আর যে দ্বেষরহিত শ্রদ্ধাবান মানুষ এই কথা শুনবে সে মুক্ত হয়ে পুণ্যকর্মা লোকদের লোক প্রাপ্ত হবে।"

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৬-৮-৩১]

৩০

সত্যে সৌন্দর্য

বস্তুর দুই দিক—বাহির ও ভিতর। আমার কাছে ইহা নেহাতই তারতম্যের প্রশ্ন। বাহ্যের মূল্য ততটা যতটা তাহা আন্তর-বিকাশের সহায়ক। অতএব তাহাই যথার্থ কলা (art) যাহাতে আত্মার বিম্ব প্রতিফলিত হয়। যে বাহ্যরূপে অশরীরী সত্তার যতটা প্রকাশ, তাহার মূল্য ততটা। ঐরূপ শিল্পকলার প্রতি আমার অশেষ আকর্ষণ। কিন্তু এ কথা আমার অজানা নয় যে, যাহাদের শিল্পে আত্মার উর্ধ্বে উঠার প্রেরণা ও ব্যাকুলতার নামগন্ধ পর্যন্ত নাই তাহারাও নিজেদের শিল্পী বলে আর লোকেও তাহাদের শিল্পী বলিয়া মানে।

আত্মোপলব্ধির সহায়ক কলাই যথার্থ কলা। নিজের কথায় বলিতে পারি যে, আত্মোপলব্ধির ব্যাপারে কোনপ্রকার বাহ্য রূপের দরকার আদৌ আমার নাই। অতএব আপনারা যাহাকে ললিত

কলা বলেন তাহার কোন নিদর্শন আমার আশেপাশে না থাকিলেও আমার জীবন বস্তুত কলাময় এ কথা বলিতে পারি। আমার ঘরের দেওয়ালে ছবি নাই। যদি মাথার উপর চালা না থাকে তো আরও ভাল; সেস্থলে দিগন্তবিস্তৃত তারকা-খচিত আকাশের অপরূপ শোভা দেখিতে পাইব। উপরের দিকে তাকাইলে দীপ্তিমান তারকা-সজ্জিত আকাশ আমার সামনে অফুরন্ত মনোরম দৃশ্যপট খুলিয়া ধরে; মানুষের যত্ন-সৃষ্ট কলা কি তাহা পারে! তাহা বলিয়া কেহ যেন মনে করিবেন না যে সাধারণত লোকে যাহাকে কলা বলে তাহার কোন মূল্যই আমার কাছে নাই। তবে প্রকৃতির শাশ্বত রূপের যেসব প্রতীক আমার সম্মুখে সদাবিদ্যমান তাহার তুলনায় ওই সব কতই না তুচ্ছ! মানুষের সৃষ্ট ওই সব কলার মূল্য ঠিক ততটা যতটা তাহা মানুষকে আত্মোপলব্ধির দিকে আগাইয়া দেয়।

সৌন্দর্য দেখি আমি সত্যে, পাই তাহা আমি সত্যে। সত্য সর্বতোভদ্র—যে ভাবে সত্যের স্ফূর্তি, যে মুখমণ্ডলে সত্যের আভা, যে চিত্রে সত্যের প্রকাশ, যে সুরে সত্যের ঝঙ্কার সে সবই সুন্দর, দিব্য সুন্দর। সত্যে সাধারণত লোকে সুন্দর দেখিতে পায় না; সাধারণ লোকে সত্য হইতে চক্ষু ফিরাইয়া লয়, চক্ষু বুজিয়া তাহা এড়ায়। সত্যে যখন মানুষ সুন্দর দেখিতে শিখিবে তখন যথার্থ কলার অভ্যুদয় হইবে।

প্রকৃত শিল্পীর কাছে সে মুখই—বাহ্য রূপ তাহার যাহাই হোক—সুন্দর যে মুখ অন্তরের সত্যে দীপ্তিমান। সত্য নাই তো সুন্দরও নাই। পক্ষান্তরে বাহ্যত যাহা আদৌ সুন্দর নহে তাহাতেও সত্যের প্রকাশ দেখা যায়। শোনা যায় তাঁহার যুগে সক্রেটিসের মত সত্যনিষ্ঠ কেহ ছিল না অথচ তাঁহার মত কুরূপ নাকি গ্রীসে আর দ্বিতীয় ছিল না। আমার মনে হয় তিনি সুন্দর ছিলেন, তাহার কারণ সারা জীবন তিনি সত্যের সাধনা করিয়াছিলেন। আর

আপনারা জানেন যে সক্রেটিসের বাহ্যরূপ অমনটা হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার অন্তরের সত্যসুন্দরকে বুঝিতে ফিডিয়াসের অসুবিধা হয় নাই যদিও শিল্পী হিসাবে ফিডিয়াস বাহ্যরূপেও সুন্দরকে দেখিতে অভ্যস্ত ছিলেন।

সত্য ও অসত্য অনেক সময় একসঙ্গে থাকে ; ভাল-মন্দ প্রায়ই একে অন্যের দোসর। শিল্পীতেও তেমনি বস্তুর যথার্থ ও অযথার্থ অনুভব অনেক সময় পাশাপাশি থাকে। শিল্পীর হৃদয়ে যখন যথার্থ অনুভবের ক্রিয়া চলে তখন তাহার তুলিতে বা ছেনিতে দিব্য ছবি ফুটিয়া ওঠে। এরূপ উপলব্ধি-ক্ষণ জীবনে যেমন দুর্লভ, শিল্পেও তেমন দুর্লভ।

এই সকল দিব্য রূপ (সূর্যাস্ত অথবা তারকারাজি পরিবৃত অর্ধ-চন্দ্র) সত্যময়। কারণ তাহাদের দর্শনমাত্র আমার মন ধাবিত হয় তাহাদের অন্তরালে বিরাজমান স্রষ্টার প্রতি। সৃষ্টির মূলে যদি সত্য না থাকিবে তবে এই সবের সৌন্দর্য কোথা হইতে আসিল? সূর্যাস্তের গরিমা বা চন্দ্রের অপূরূপ শোভা যখন দেখি তখন বিধাতৃচরণে হৃদয় লুটাইয়া পড়ে। তাঁর সৃষ্ট চরাচরে আমি তাঁকে ও তাঁর করুণা দেখিতে চেষ্টা করি। সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে আমার হৃদয় যদি তদভিমুখী না হইত তবে তাহা হইত নিছক প্রতিবন্ধক। যাহা আত্মার ঊর্ধ্বগতির সহায়ক নহে তাহা ভ্রম ও বন্ধনপাশ, যেমন দেহ অনেক সময় বস্তুতপক্ষে মুক্তির পথে বিঘ্ন হইয়া দাঁড়ায়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৩-১১-২৪]

গোড়ার কথা সত্যোপলব্ধি। সত্যোপলব্ধি হইয়াছে তো সুন্দর আসিবে, শিব আসিবে। গিরি-প্রবচনে খ্রীষ্ট বস্তুত সেই শিক্ষাই আমাদের দিয়াছেন। আমি মনে করি যীশু অতি বড় শিল্পী ছিলেন, কারণ তিনি সত্য দর্শন করিয়াছিলেন, প্রকাশ করিয়াছিলেন। মহম্মদও অতি বড় শিল্পী ছিলেন, কারণ সমগ্র আরবি ভাষায়

কোরানের তুল্য নিখুঁত সুন্দর রচনা আর কিছু নাই, অন্তত পণ্ডিতদের তাহাই অভিমত। তাঁহারা উভয়েই প্রথমে সত্যের সাধনা করিয়াছিলেন তাই সহজেই তাঁহাদের ভাষা এত সাবলীল ও মহিমা-মণ্ডিত। অথচ কি যীশু, কি মহম্মদ কেহই শিল্প সম্বন্ধে লিখেন নাই। ঐ সত্য ও সুন্দরকেই তো আমি পাইতে চাই, তাহার জন্যই এই জীবনধারণ আর প্রয়োজন হয় তো তাহার জন্যই তাহা পাত করিব।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২০-১১-২৩]

অন্য সব বিষয়ে যেমন এখানেও তেমন অগণিত জনতার দিকে তাকাইয়াই কথা বলিব। যে শিক্ষা দিলে জনতা সুন্দর-এ সত্য দেখিতে পাইবে সেই শিক্ষা আমরা তাহাদের দিতে পারিতেছি না। আগে তাহাদের সত্য দর্শন করান তখন তাহারা সুন্দর দেখিবে...... অগণিত নিরন্ন জনতার যাহাতে দরকার, তাহাই আমার মতে সুন্দর। জীবনের আবশ্যিক বস্তু তাহাদের প্রথমে দিন, তখন সকল মাধুরী সকল সুষমা আপনা হইতেই আসিবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২০-১১-২৪]

যথার্থ শিল্প কেবল রূপ দেখে না, রূপের অন্তরালেও দেখে। শিল্প মারকও হইতে পারে, তারকও হইতে পারে। যথার্থ শিল্পে শিল্পীর আনন্দ, সন্তোষ ও পবিত্রতা ফুটিয়া উঠে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১১-৮-২১]

ব্যক্তিগত জীবনের পবিত্রতা-অপবিত্রতার সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক নাই এমন একটা ভাব কি যেন কিভাবে আমাদের মনে গাঁথিয়া গিয়াছে। আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা হইতে এ কথাই বলিব যে, ইহা

অপেক্ষা অসত্য আর কিছু হইতে পারে না। জীবনের অন্তিম প্রান্তে পৌঁছিয়াছি ঃ এ কথা বলিতে পারি যে পবিত্র জীবন অপেক্ষা উত্তম ও খাঁটি কলা আর কিছু নাই। গলা সাধিয়া উত্তম গান গাওয়ার কলা আয়ত্ত করা অনেকের পক্ষে কঠিন নয় কিন্তু পবিত্র জীবনের সুরসঙ্গম হইতে তেমন উত্তম রাগ সৃষ্টির কলা আয়ত্ত করা অতীব দুষ্কর।

[হরিজন, ১৯-২-৩৮]

৩১

রামনাম

যদিও বুদ্ধি ও ভক্তি দিয়া বহুদিন আগেই বুঝিয়াছি যে সত্য ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ বিভূতি ও অভিধা তথাপি সত্যকে আমি রাম বলিয়া জানি। ঘোর সংকটের দিনে ঐ নাম আমায় রক্ষা করিয়াছে, আজও করিতেছে। বাল্যকালের পরিবেশ বা তুলসীদাসের প্রভাব ইহার কারণ হইতে পারে। কারণ যাহাই হোক ব্যাপারটা ইহাই। এই কথা লিখিতেছি আর আমার স্মৃতিপটে ভাসিয়া উঠিতেছে আমাদের পৈত্রিক নিবাসের সন্নিকটস্থ রামজী মন্দিরের ছবি ; প্রতিদিন তথায় আমি যাইতাম। আমার রাম তখন সেখানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সে রাম আমাকে কত না ভয়ের, কত না পাপের হাত হইতে বাঁচাইয়াছেন। আমার কাছে তাহা কুসংস্কার মনে হয় নাই। পূজারী হয়তো খারাপ লোকই ছিল। তাহার বিরুদ্ধে আমি কিছু জানি না। মন্দিরে কুকর্ম হয়তো হইয়া থাকিবে। তৎসম্বন্ধেও আমি কিছু জানি না। অতএব উহার প্রভাব আমার উপর পড়ে নাই। কোটি কোটি হিন্দুদের সম্বন্ধে এ কথাই সত্য।

[হরিজন, ১৮-৩-৩৩]

রাম ও রামনাম তো কেবল হিন্দুদের জন্য, মুসলমান তাহাতে যোগ দিবে কি করিয়া, এ কথা শুনিলে আমার হাসি পায়। মুসলমানের ভগবান এক, হিন্দুর আর, পার্শী বা খ্রীষ্টানের আর এক, এমন কি কখনও হইতে পারে? না, ভগবান এক—সর্বশক্তিমান, সর্বত্র বিরাজমান। নানা নামে লোকে তাঁকে ডাকে; আমরা যে নামে তাঁকে জানি সে নামে ডাকি।

আমার রাম—প্রার্থনায় যে রামের নাম লই সে রাম ইতিহাসে বর্ণিত অযোধ্যার রাজা দশরথপুত্র রাম নহেন। তিনি শাশ্বত, অজ, অদ্বিতীয়। একমাত্র তাঁরই আরাধনা আমি করি। তাঁরই শরণ আমি লই আর আপনাদেরও লইতে বলি। সকলের কাছে তিনি সমান। অতএব মুসলমান বা অন্য কেহ কেন যে তাঁর নাম লইতে আপত্তি করে তাহা আমি বুঝি না। আর রামনামকে ভগবান বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে এমনও কোন কথা নাই। তিনি মনে মনে আল্লা বা খোদা বলিতে পারেন—প্রার্থনার তান-লয় নষ্ট না হয় তাই মনে মনে।

[হরিজন, ২৮-৪-৪৬]

শৈশব হইতে আমি তুলসীদাসের অনুরাগী আর তাই রামরূপে আমি ভগবানের উপাসনা করি। কিন্তু আমি জানি যে ওঁ-কার হইতে আরম্ভ করিয়া নানা স্থানে, দেশে ও ভাষায় ভগবানের যত নাম আছে উহার যে কোনটি লইলেই হইল—ফল তাহার একই। তিনি ও তাঁর বিধি অভিন্ন। সুতরাং তাঁহার বিধি পালন করাই উপাসনার সর্বোত্তম রূপ। যাহার জীবনাচরণ ঐ বিধি-অনুসারী, মুখে নাম না লইলেও তাহার চলে। অন্য কথায়, ভগবানের আরাধনা যাহার কাছে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার মত স্বাভাবিক সে ভগবৎ-প্রেরণায় এমনই অনুপ্রাণিত যে, এই বিধির জ্ঞান বা আচরণ যেন তাহার

স্বভাবেরই অঙ্গ হইয়া যায়। এরূপ ব্যক্তির আর কোন কিছুর দরকার নাই।

তবেই প্রশ্ন ওঠে, এমন অব্যর্থ আধি-নাশক হাতের কাছে থাকিতে তাঁর কথা প্রায় জানি না কেন, আর যাহারা জানে তাহারাও তাঁকে ডাকে না কেন অথবা অন্তর হইতে না ডাকিয়া তোতা পাখির মত ডাকে কেন? তাহারা তোতা পাখির মত নাম করে, ইহা হইতে সূচিত হয় যে ভগবান যে সর্ব আধি-ব্যাধি-হর এই জ্ঞান তাহাদের জন্মে নাই।

[হরিজন, ২৪-৩-৪৬]

রামভক্তকে গীতার স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যাইতে পারে। আরও একটু গভীরে গেলে দেখা যাইবে যে, যে প্রকৃত ভক্ত তাহার জীবন অক্ষরে অক্ষরে পঞ্চভূতের নিয়মানুগামী, তেমন ভক্ত অসুস্থ হইবে না। আর দৈবাৎ যদি অসুস্থ হয় তো পঞ্চভূতের সহায়ে সে নীরোগ হইবে। যে-কোনও ভাবে দেহটাকে রোগমুক্ত করার তাগিদ অন্তর-পুরুষের নাই—দেহই যাহার কাছে সব স্বভাবতই দেহকে সুস্থ করার জন্য জগতে এমন কিছু নাই যাহা সে না করিবে। কিন্তু দেহে বাস করিলেও আত্মা দেহ হইতে পৃথক্‌। দেহ বিনাশী, আত্মা অবিনাশী —এই অনুভব যাহার হইয়াছে, পঞ্চভূতে কাজ না হইলেও সে বিচলিত হইবে না, বিলাপ করিবে না। উল্টা, মৃত্যুকে সে বন্ধুরূপে আলিঙ্গন করিবে। ডাক্তারের কাছে দৌড়াদৌড়ি না করিয়া সে নিজেই নিজের চিকিৎসা করিবে। জীবাত্মার কথা তাহার মনে সতত জাগরূক থাকিবে; অন্তরাত্মার চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা তাহার মনে ঠাঁই পাইবে না।

নিঃশ্বাস লওয়ার মত সে অনুক্ষণ ভগবানের নাম লইবে। শরীর যখন ঘুমে আচ্ছন্ন তখন তাহার রাম জাগ্রত। তাহার সকল কাজে

রাম তাহার সহচর। এই পাবন সান্নিধ্য হইতে বঞ্চিত হইলে এইরূপ ভক্ত মনে করে সত্যসত্যই তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

রামকে পাওয়ার ও রাখার সহায় হিসাবে পঞ্চভূত হইতে যাহা পাওয়া যায় তাহা সে লইবে। তাহার অর্থ পৃথিবী জল সূর্য আকাশ ও ব্যোম হইতে সাহায্য আহরণের সহজ ও সুলভতর পন্থার আশ্রয় সে লইবে। এই সহায়তা রামনামের পূরক নয়ঃ রামনাম-উপলব্ধির তাহা এক উপায়। বস্তুত রামনামের কোন সহায় দরকার নাই। কিন্তু রামনামে বিশ্বাস করি আর ওদিকে ডাক্তারের কাছে দৌড়াই—ইহা দুই নাওয়ে সওয়ার হওয়ার মত।

রক্ত না হইলে দেহের চলে না। তেমন অনুপম দৃঢ় বিশ্বাস ছাড়া আত্মার চলে না। এই বিশ্বাস মানুষের জীর্ণ অঙ্গসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করার শক্তি ধরে। তাই তো বলা হয়, রামনাম হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইলে মানুষ নবজন্ম লাভ করে। এই কথা যুবক-বৃদ্ধ, নরনারী সকলের পক্ষেই সত্য।

[হরিজন, ২৯-৬-৪৭]

৩২

স্বভাব নিরাময়

প্রাকৃতিক চিকিৎসা মানে মানুষের পক্ষে যে চিকিৎসা শোভন সেই চিকিৎসা। 'মানুষ' বলিতে কেবল জন্তু-মানব বুঝায় না, দেহের অতিরিক্ত মন ও আত্মাও বুঝায়। এরূপ জীবের পক্ষে রামনামের তুল্য খাঁটি প্রাকৃতিক চিকিৎসা আর কিছু নাই। ইহা অব্যর্থ ঔষধ। রামনাম হইতে রামবাণ কথাটি আসিয়াছেঃ রামবাণ মানে অব্যর্থ ঔষধ। প্রকৃতিও বলে যে এই চিকিৎসাই মানুষকে ঠিক মানায়।

যে কোন অসুখেই লোক ভুগুক না কেন, অন্তর হইতে রামনাম করিলে তাহা নিশ্চিত সারিবে। ভগবানের অনেক নাম। যে নামে যাহার রুচি সেই নামে সে ভজনা করিতে পারে। ঈশ্বর আল্লা খোদা গড্ বলিতে একই সত্তা বুঝায়। তোতা পাখির মত আবৃত্তি করিলে হইবে না, বিশ্বাসভরে ডাকা চাই ; বিশ্বাস আছে কি নাই তাহার কতকটা প্রমাণ মিলিবে আচরণ হইতে। সেই প্রযত্ন বা আচরণের রূপ কি ? পৃথিবী জল আকাশ সূর্য ও বায়ু এই পঞ্চভূত হইতে নিরাময়ের উপায় বাছিয়া লইতে এবং তাহাতেই তুষ্ট থাকিতে হইবে। কিন্তু রামনাম উহার অপরিহার্য অঙ্গ হইবে। তাহা সত্ত্বেও যদি মৃত্যু আসে তো কিছু মনে করার নাই। উল্টা, উহাকে স্বাগত করিতে হইবে। এই দেহকে অবিনশ্বর করার মত কোন ঔষধ বিজ্ঞান আজও আবিষ্কার করিতে পারে নাই। অমরত্ব আত্মার বিভব। আত্মা অবিনশ্বর। কিন্তু উহার নিষ্কলঙ্ক স্বরূপ প্রকট করা মানুষের ধর্ম।

[হরিজন, ৩-৩-৪৬]

উপরের যুক্তি গ্রাহ্য হইলে প্রাকৃতিক চিকিৎসার উপকরণসংখ্যা স্বতঃই সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। আর সে স্থলে মানুষ বড় বড় হাস-পাতালের বহুবিধ যান্ত্রিক উপকরণ ও আসবাবপত্রের হাত হইতে, খ্যাতনামা ডাক্তারের হাত হইতে বাঁচিয়া যাইবে। পৃথিবীর বেশীর ভাগ লোকের ভাগ্যে এইসব জোটে না। অতএব বহুর ভাগ্যে যাহা জোটে না, কতিপয় তাহা পাওয়ার বাসনা করিবে কেন ?

[হরিজন, ৩-৩-৪৬]

তবে রামনামের শক্তি শর্ত-ও সীমা-নিরপেক্ষ নয়। রামনাম ভূতসঞ্চার-প্রক্রিয়া নয়। অতি ভোজন, অতি পান হেতু কারো

অজীর্ণরোগ হইয়াছে ঃ পুনরায় বাড়াবাড়ি করার মানসে যদি সে রোগমুক্তির নিমিত্ত রামনামের শরণ লয় তো সে বৃথা। মন্দ উদ্দেশ্যের নয়, রামনাম ভাল উদ্দেশ্যের সহায়; নয়তো চোর-ডাকাত রামনামের পরম ভক্ত হইত। হৃদয় যাহাদের শুদ্ধ, যাহারা শুদ্ধ হইতে চায়, থাকিতে চায়, রামনাম তাহাদের আশ্রয়। রামনাম কখনও ভোগবিলাসের বাহন নহে। অজীর্ণের ঔষধ উপবাস, রামনাম নহে; উপবাসের ক্রিয়ান্তেই কেবল রামনামের ক্ষেত্র তৈরী হয়। হাঁ, রামনামে উপবাস সহজ হয়, সহনীয় হয়। তদ্রূপ, কেবল যদি ঔষধই খাইতে থাক আর মুখে রামনাম কর তো তাহা হইবে রামনামের পরিহাস। যে ডাক্তার নিজ নৈপুণ্য রোগীর পাপাচরণের কাজে লাগায় সে নিজে পতিত হয়, রোগীকেও পতিত করে। দেহ স্রষ্টার দেউল। সেই দেউল স্রষ্টার পূজায় না লাগাইয়া যদি নিজ পূজায় লাগাই, কোন রকমে তাহা টিকাইয়া রাখার জন্য যদি জলের মত অর্থ ব্যয় করি তো তাহা অপেক্ষা বড় অধঃপতন আর কি হইতে পারে? উল্টা, রামনাম রোগ দূর করার সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধ করে আর তাই উন্নত করে। এখানেই রামনামের মাহাত্ম্য ও সীমাবদ্ধতা।

[হরিজন, ৭-৪-৪৬]

নিয়মিত রামনাম করে, শুদ্ধ জীবন যাপন করে এমন লোকেরও তো অসুখ হয়। কেন হয়? প্রশ্নটি সঙ্গত। স্বভাবধর্মেই মানুষ অপূর্ণ। জ্ঞানী মানুষ পূর্ণ হওয়ার প্রযত্ন করে কিন্তু পূর্ণ কখনও হয় না। পথে সে হোঁচট খাইতে থাকে, হোক না অজ্ঞাতে। ভগবানের যাবতীয় বিধি শুদ্ধ জীবনে সাকার হয়। সর্বাগ্রে বুঝিতে হইবে নিজ অক্ষমতার সীমার কথা। এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে সেই সীমা লঙ্ঘন করিলেই অসুখে পড়িতে হয়। সুতরাং দেহের প্রয়োজন মত মিতাহার করিলে দেহ রোগমুক্ত থাকে। সুষম খাদ্য

(উপযুক্ত খাদ্য) কি তাহা কিরূপে বুঝা যাইবে ? এরূপ আরও প্রশ্নের কথা ভাবা যায়। আসল কথা, নিজেই নিজের বৈদ্য হইতে হইবে, নিজ সীমার, নিজ অক্ষমতার কথা বুঝিতে হইবে। এ ভাবে যে চলিবে সে নিশ্চয় শতায়ু হইবে।

[হরিজন, ১৯-৫-৪৬]

স্বভাব-নিরাময় ও বিভিন্ন দেশীয় চিকিৎসা-প্রণালীর প্রতি আমার অনুরাগ তো আছেই, তাহা বলিয়া প্রেতবিদ্যা বলিয়া যে বিদ্যার নিন্দা করিয়াছি সেই পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতির কথা আমি অস্বীকার করি না। জ্যান্ত-ব্যবচ্ছেদ যে কী নিষ্ঠুর কর্ম তাহা জানিয়া বুঝিয়াও পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান ঐ কার্যে সায় দেয় বলিয়া, এই দেহকে দুই দিন বেশী টিকাইয়া রাখার জন্য যে-কোন অন্যায় কার্য করিতে পরাঙ্মুখ নয় বলিয়া এবং দেহাভ্যন্তরনিবাসী অমর আত্মাকে অস্বীকার করে বলিয়া ঐ কঠোর শব্দ আমি ব্যবহার করিয়াছি আর প্রত্যাহারও তাহা আমি করিতেছি না। প্রাকৃতিক চিকিৎসার ন্যূনতার ও উদ্যমবিহীন প্রাকৃতিক-চিকিৎসকদের অসার দাবির কথা অবগত থাকা সত্ত্বেও আমি প্রাকৃতিক চিকিৎসার পক্ষপাতী। সব চাইতে বড় কথা, প্রাকৃতিক চিকিৎসায় স্ত্রী-পুরুষ সকলেই নিজের বৈদ্য নিজে হইতে পারে, অন্য কোন চিকিৎসা-পদ্ধতিতে সে সুযোগ নাই।

[হরিজন, ১১-৮-৪৬]

অন্য সব বলের মত আধ্যাত্মিক বলও মানুষের সেবার নিমিত্তে। শারীরিক ব্যাধি নিরাময়ের ব্যাপারে এই বল হইতে আবহমান কাল অল্পাধিক সুফল পাওয়া গিয়াছে, সে কথা না হয় ছাড়িয়াই দিই ; শারীরিক ব্যাধি নিরাময়ের বিষয়ে যদি উহা ফলপ্রদ হয় তো উহা

ব্যবহার না করা স্বতঃই অন্যায় হইবে। কারণ, মানুষ যেমন শরীরী তেমনি অশরীরী আর একের ক্রিয়ার প্রভাব অন্যতেও বর্তায়। অগণিত লোকের কুইনিন জোটে না, তাহা সত্ত্বেও কুইনিন ব্যবহার করিয়া আপনি ম্যালেরিয়া হইতে বাঁচেন। তাহা যদি হয়, তবে অগণিত মানুষ অজ্ঞানতা বশত এই সুলভ উপচারের আশ্রয় লয় না বলিয়া কি আপনিও লইবেন না ? লাখো লাখো লোকে অজ্ঞতার কারণে অথবা হয়তো বা নিছক জেদ বশেই যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না থাকে, সুস্থ না থাকে তবে আপনিও কি তাহাই করিবেন ? মানবপ্রেমের ভ্রান্ত ধারণা বশত আপনি যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না থাকেন তবে অপরিচ্ছন্নতার ও অসুস্থতার দরুন সেই অগণিত মানবের সেবারূপ কর্তব্য হইতে আপনি বঞ্চিত হইবেন। দেহের মলিনতা ও অসুস্থতা দূর-না-করা তো মন্দ বটেই, তাহা হইতেও অনেক বেশী মন্দ আধ্যাত্মিক মলিনতা ও অসুস্থতা দূর-না-করা।

[হরিজন, ১-৯-৪৬]

সর্ব বিষয়ে স্বচ্ছ ও সুস্থ হওয়ার নাম মুক্তি। স্বচ্ছ-সুস্থ অন্তর্বাহ্যের অধিকারী হইয়া অন্যের পথপ্রদর্শক হওয়ার, ততোধিক তাহাদের সেবা করার সুযোগ পান তো সেই সুযোগ আপনি খোয়াইবেন কেন ?

[হরিজন, ১-৯-৪৬]

৩৩

জীবমাত্র এক

কেবল লাঙ্গুলহীন বাঁদরকেই নয়, ঘোড়া-ভেড়া, সিংহ-চিতা, সাপ-বিছাকেও কুটুম্ব মানিতে আমার নীতিবোধে বাধে না, বরং আমার নীতিবোধ এই কথাই বলে যে উহাদের আত্মীয় জ্ঞান করা আমার ধর্ম। উহাদের দিক হইতে আমাকে কুটুম্ব মানার প্রশ্ন এখানে নাই। যে অলঙ্ঘনীয় নীতিবোধ দ্বারা আমার জীবন শাসিত আর অন্য সকলেরও শাসিত হওয়া উচিত সেই নীতিবোধ এই এক-তরফা কর্তব্য আমাদের উপর চাপাইতেছে। এই কর্তব্য যে মানুষে অর্শাইয়াছে তাহার কারণ একমাত্র মানুষকেই ভগবান তাঁর আপন ছাঁচে গড়িয়াছেন। এই পদবোধ যে আমাদের সকলের নাই তাহাতে কিছু আসে-যায় না, কেবল ইহা বাদে যে যে-লাভ এই পদবোধ থাকিলে আমাদের হইতে পারিত সেই লাভ হয় না, যেমন হয় না মেষপালে বর্ধিত নিজ মর্যাদা সম্বন্ধে অজ্ঞ সিংহের। তাহা বলিয়া সিংহ তাহার সিংহত্ব হারায় না, যখনই তাহার নিজ পদবোধ ফিরিয়া আসে তখনই সে মেষপালের উপর প্রভুত্ব করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু সিংহের ভেকধারী মেষ কোনদিনও সিংহপদ লাভ করে না। মানুষ ভগবানের আপন ছাঁচে গড়া ইহা সপ্রমাণ করার জন্য সকলেরই নিজ নিজ শরীরে ভগবানের রূপ প্রতিবিম্বিত করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। কোন এক মানুষে তেমনটি হইয়াছে ইহা প্রমাণ করিতে পারিলেই যথেষ্ট। মহান্ ধর্মোপদেষ্টারা নিজ নিজ শরীরে ভগবানের বিভূতি প্রকট করিয়াছেন এ-কথা কি অস্বীকার করা যাইবে ?

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৮-৭-২৬]

সাপেরও জীবন নাশ করিয়া আমি বাঁচিয়া থাকিতে চাই না। সাপে আমাকে কামড়াইলেও উহাকে আমি মারিব না। ভগবান যদি ঐ কঠোর পরীক্ষায় আমায় ফেলেন আর আমি মরিতে ভয় পাই তবে হয়তো আমার পশু-প্রকৃতি বলবান হইবে। আর এই নাশশীল দেহের রক্ষার্থে সাপকে মারিতে আমি উদ্যত হইব। সাপের ভয় নিঃশেষে অপগত হইয়াছে, যেমনটা আমার ইচ্ছা তেমনটা বন্ধুভাবে আমি বিষধর সাপকে দেখিতে শিখিয়াছি—এ কথা বলার মত জ্বলন্ত বিশ্বাস আজও আমার লাভ হয় নাই ইহা আমি স্বীকার করি। আমরা অন্তরে যে বিষ-ভাবনা, দুষ্ট ও মন্দ চিন্তা পোষণ করি, সাপ বাঘ ইত্যাদি উহারই ভগবদ্দত্ত প্রত্যুত্তর এ বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত।...আমি বিশ্বাস করি সকল জীবন এক। চিন্তা বিভিন্ন রূপ ধরে। বাঘ, সাপ আমাদের সহিত কুটুম্বসূত্রে যুক্ত। কুচিন্তা, দুষ্ট ভাবনা, কামুকতা মনে স্থান দিও না এই সতর্কবাণী উহারা (বাঘ-সাপ) উচ্চারণ করিতেছে। বিষাক্ত জন্তু ও সরীসৃপ হইতে পৃথিবীকে মুক্ত করা যদি কাম্য হয় তবে অন্তর হইতে সমস্ত বিষ-ভাবনা দূর করিতে হইবে। অধীর অজ্ঞতার কারণ অথবা এই দেহকে আরও কিছু সময় টিকাইয়া রাখার মানসে আমি যদি তথাকথিত বিষধর জন্তু ও সরীসৃপ মারি তো বিষ-ভাবনা হইতে মুক্ত হওয়া যাইবে না। এরূপ নাশক জন্তু হইতে আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা না করিয়া যদি মরিয়া যাই তো পরজন্মে আমি উত্তমতর ও পূর্ণতর মনুষ্যজীবন লাভ করিব। এই বিশ্বাস পোষণ করার পরেও আমি কি কখনও সর্পরূপী সহ-জীবকে হনন করিতে পারি ?

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৪-৪-২৭]

মৃত্যুর ঘেরা জালের অন্ধকারে আমরা সত্যের খোঁজ করিতেছি। জীবনের পদে পদে যে ভয় রহিয়াছে তাহা সম্ভবত আমাদের

কল্যাণেরই জন্য, কারণ এই ভয়ের কথা ও যে কোন মুহূর্তে মৃত্যু ঘটিতে পারে এ কথা জানা সত্ত্বেও সকল জীবের যাহা মূল আধার সে দিকে ফিরিয়াও আমরা তাকাই না—এমনই আমাদের ঔদাসীন্য আর এই ঔদাসীন্যকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে আমাদের অদ্ভুত অহমিকা।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৭-৭-২৭]

কিছু না কিছু হিংসা দেহধারীর করিতেই হয়। তাই পরম ধর্ম অহিংসার বর্ণনা নেতি শব্দে করা হইয়াছে। জগত হিংসার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। অন্য কথায়, দেহ রক্ষা করিতে হইলেই হিংসা করিতে হয়। তাই তো অহিংসার সাধকের নিরন্তর প্রার্থনা, জন্মের ফেরে আর যেন তাহাকে পড়িতে না হয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৪-১০-২৮]

এই দেহ-আবরণের আসক্তির কারণে আমি যে নিরন্তর হিংসা করিতেছি তাহা আমি জানি আর তাহার জন্য দুঃখ অনুভব করি। তাই তো এই শরীরের বিষয়ে আমার ঔদাসীন্য দিন দিন বাড়িতেছে। উদাহরণার্থ, নিঃশ্বাস প্রক্রিয়ায় বাতাসে ভাসমান অসংখ্য জীবাণু আমি ধ্বংস করি। কিন্তু নিঃশ্বাস লওয়া তো আমি বন্ধ করি না। তরিতরকারি খাইলেও হিংসা করা হয় কিন্তু দেখিতেছি তাহা বন্ধ করিতে পারিতেছি না। জীবাণুনাশক পদার্থের ব্যবহারও হিংসা, তবুও মশা বা তদ্রূপ আপদ্ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য কেরোসিনের মত জীবাণুনাশকের ব্যবহার হইতে আমি বিরত হইতে পারিতেছি না। আশ্রমের বিষধর সর্পকে ধরিয়া দূরে সরাইয়া না দিতে পারিলে তা আমি মারিতে দিই। আশ্রমের বলদ তাড়াইবার জন্য পাচনির ব্যবহারে আমি আপত্তি করি না। তাই প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষ-ভাবে কত যে হিংসা আমি করি তার সীমা-সংখ্যা নাই। এই

দীন স্বীকারোক্তির ফলে বন্ধুরা যদি আমায় সংশোধনের অতীত বলিয়া হতাশ হন তো আমি নাচার কিন্তু অহিংসার আচরণে আমার যে অপূর্ণতা আছে তাহা লুকাইবার চেষ্টা আমি কোনমতেই করিব না। অহিংসার ন্যায় মহৎ আদর্শের তাৎপর্য উদ্‌ঘাটন করার এবং তদনুসারে চলার নিরন্তর চেষ্টা আমি করিতেছি আর তাহাতে, আমার বিশ্বাস, কিছুটা সফলও হইয়াছি ইহার অধিক কিছু দাবি আমি করি না। কিন্তু আমি জানি এদিকে আরও অনেক পথ আমাকে চলিতে হইবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১-১১-২৮]

আমার বিশ্বাস অহিংসা আমার অণু-পরমাণুতে ব্যাপ্ত। অহিংসা ও সত্য আমার দুই শ্বাসযন্ত্র। অহিংসা ছাড়া আমার বাঁচা অসম্ভব। কিন্তু অহিংসার শক্তি যে কত অসীম ও মানুষ যে কত তুচ্ছ সে কথা জীবনের প্রতি মুহূর্তে আমি অধিকতর স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইতেছি। হৃদয় যতই করুণায় ভরা হোক না কেন বনবাসী ঋষির পক্ষেও একেবারে হিংসাবর্জিত হওয়া সম্ভব নয়। প্রতি নিঃশ্বাসে সে কিছুটা হিংসা করে। দেহটাই এক কসাইখানা। অতএব এই দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হইলেই কেবল মোক্ষ ও অক্ষয় আনন্দ লাভ হয়। সুতরাং মোক্ষের সুখ ছাড়া অন্য সুখ ক্ষণস্থায়ী ও অপূর্ণ। তাই না হিংসার তেতো বিষ দিনে অনেকবার গিলিতে হয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২১-১০-২৬]

আমি সত্যসত্যই বিশ্বাস করি যে, যে কোন অছিলায় নরহত্যা করিতে আমরা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি বলিয়া মানুষের বুদ্ধি মলিন হইয়া গিয়াছে আর তাই অপর প্রাণীর জীবন নাশ করিতে তাহার বাধে না। ভগবান প্রেমময়, দয়াময় এ কথা যদি সে সত্যই বিশ্বাস

করিত তবে এ ভাবে জীবন নাশ করিতে তাহার হৃৎকম্প হইত। সে যাহা হোক, মৃত্যুভয়ে যদিও বাঘ সাপ প্লেগ-কীট মশা ইত্যাদি মারি তবু সেই জ্ঞানোদয়ের জন্য সতত প্রার্থনা করি যাহার উদয়ে মৃত্যুভয় দূর হইবে, জীবননাশে বিরত হইয়া উত্তম পথে জীবনের মোড় ঘুরিবে, কারণ ঃ

করুণাময়ের করুণা থেকে
লভেছি দীক্ষা করুণার।

[হরিজন, ৯-১-৩৭]

গরু

মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে গরুর মত নির্বিরোধ শান্ত প্রাণী আর নাই। মনুষ্যেতর প্রাণী-জগতের প্রতিনিধিরূপে গরু জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের কাছে ন্যায় যাচ্ঞা করে। উহার চোখ যেন বলে, "তোমরা আমাদের হন্তা, ভোক্তা বা নির্যাতকরূপে নয় পরন্তু মিত্র ও অভিভাবক রূপে নিযুক্ত হয়েছ।"

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৬-৬-২৪]

গো-তে আমি দেখি করুণ কাব্য। আমি গরুর পূজা করি। সারা দুনিয়া এই পূজার নিন্দা করিলেও আমি গো-পূজার সমর্থন করিব।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১-১-২৫]

৩৪

ব্রহ্মচর্য কি

কোন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছেনঃ 'ব্রহ্মচর্য কি? তা কি পুরাপুরি পালন করা যায়? সম্ভব হয় তো আপনি পালন করেন কি?'

ব্রহ্মচর্য মানে ব্রহ্মের খোঁজ—ইহাই পূর্ণ ও যথার্থ অর্থ। ব্রহ্ম সর্বব্যাপী। অতএব গভীরে ডুবিয়া, অন্তরাত্মাকে উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে খুঁজিতে হয়। রিপুসমূহ পূর্ণ বশে না আসিলে ঐ উপলব্ধি হয় না। সর্ব সময়ে ও সর্ব স্থলে কায়মনোবাক্যে ইন্দ্রিয় নিগ্রহের নাম ব্রহ্মচর্য।

পূর্ণ ব্রহ্মচারী নর বা নারী কাম-বাসনা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। এরূপ মানুষ স্বভাবতই ভগবানের সন্নিধানে স্থিত, ভগবান-সদৃশ।

এরূপ ব্রহ্মচর্য কায়মনোবাক্যে পুরাপুরি পালন করা যায় এ বিষয়ে আমার সংশয় নাই।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৫-৬-২৪]

যে সত্যনিষ্ঠ, যে সত্যের উপাসক তাহার পক্ষে অন্য কোন দিকে শক্তি বিনিয়োগ করার উপায় নাই, করিলে সে সত্যভ্রষ্ট হয়। অতএব, বিষয়-সেবা সে করিতে পারে কি? স্বার্থলেশশূন্য না হইলে সত্যোপলব্ধি হয় না, তাই সত্যোপলব্ধির জন্য যাহার সকল কর্ম নিয়োজিত সন্তানোৎপাদন ও পরিবার প্রতিপালনের মত স্বার্থপর কর্মে তাহার রুচি থাকিতে পারে না। উপরের মন্তব্য হইতে দেখা যাইবে যে, ভোগপরায়ণতা ও সত্যোপলব্ধি এক সঙ্গে চলে না বা একে অন্যের বিরোধী।

অহিংসার দিক হইতে দেখিলে দেখা যাইবে যে, স্বার্থশূন্য না হইলে অহিংসার আচরণ করা যায় না। অহিংসা অর্থ সর্বভূতে প্রেম। নর নারীকে বা নারী নরকে যদি সমস্ত ভালবাসা সমর্পণ করিয়া বসে তবে বাকী দুনিয়ার জন্য কিছু অবশিষ্ট থাকে কি? তাহার অর্থ "আমরা দুই, তারপরে দুনিয়ার যা হয় হোক।" পতিগত পত্নীর ও পত্নীগত পতির একে অন্যের জন্য সব কিছু সমর্পণ করিতে হয় তাই তাহাদের পক্ষে সর্বজনীন প্রেমের স্তরে ওঠা বা সকলকে কুটুম্বরূপে দেখা সম্ভবপর নহে। কারণ ভালবাসাকে তাহারা গণ্ডিবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। যাহাদের পরিবার যত বড় তাহারা সর্বজনীন প্রেম হইতে তত দূরে। অতএব যে অহিংসা ধর্ম পালন করিতে চায় তাহার বিবাহ করা চলে না, অবৈধ প্রেমের কথা ত ওঠেই না।

তাহা যেন হইল। কিন্তু যাহারা বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছে? তাহাদের পক্ষে সত্যোপলব্ধি কি আদৌ সম্ভব নহে? মানবের সেবার জন্য তাহারা কি কখনও সব কিছু অর্ঘ্য দিতে পারে না? একটা পথ তাহাদের জন্য আছে। তাহাদের বিবাহ হয় নাই এ ভাবে তাহারা চলিতে পারে। যাঁহারা এই সুখদ অবস্থায় পৌঁছিয়াছেন তাঁহারা আমার কথা সমর্থন করিবেন। আমার পরিচিত অনেকে এই পরীক্ষায় সফল হইয়াছেন। স্বামী-স্ত্রী যদি ভাইবোনের মত আচরণ করে তবে সার্বজনিক সেবার জন্য তাহারা মুক্ত হইবে। নারীমাত্রই ভগ্নী মাতা বা দুহিতা এ ভাব জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে মানুষ উন্নত হয়, বন্ধনরজ্জু তাহার ছিন্ন হয়। এতে স্বামী-স্ত্রীর বা তাহাদের পরিবারের কোন ক্ষতি হয় না, হয় সম্পদ্ বৃদ্ধি। কামগন্ধরহিত হয় বলিয়া তাহাদের প্রেমবন্ধন দৃঢ় হয়। আবিলতা দূর হওয়ার দরুন পরস্পরের অধিকতর উত্তম সেবার তাহারা যোগ্য হয় আর কলহ মনোমালিন্যের হেতুও অনেক কমিয়া যায়। প্রেম যেখানে স্বার্থে মলিন ও বন্ধনের গণ্ডিতে আবদ্ধ সেখানে ঝগড়ার প্রসঙ্গ অধিক।

উপরের যুক্তি গ্রাহ্য হইলে বীর্য-ধারণের দৈহিক লাভালাভের প্রশ্ন গৌণ হইয়া যায়। ইন্দ্রিয়সুখের জন্য জানিয়া বুঝিয়া বীর্য-ক্ষরণ করা কীদৃশ অবোধের কাণ্ড! দৈহিক ও মানসিক শক্তির পূর্ণ বিকাশের জন্য যাহা উদ্দিষ্ট শারীর সম্ভোগের জন্য তাহার অপচয় মহা অপব্যয়। এই অপব্যবহার অনেক ব্যাধির মূল হেতু।

অন্য নানা ব্রতের মত ব্রহ্মচর্যও কায়মনোবাক্যে পালন করিতে হয়। যে মূর্খ মনে মনে কুভাব পোষণ করিয়া শরীর নিগ্রহ করার চেষ্টা করে সে বৃথাই চেষ্টা করে—গীতা এ কথা বলে আর অভিজ্ঞতারও সাক্ষ্য তাহাই। মনের লাগামে ঢিল দিয়া দেহ সংযত করার চেষ্টার পরিণাম হানিকারক হইতে পারে। মন যে দিকে ধায়, দেহ দুই দিন আগেপাছে সে দিকে যায়।

এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার। মনকে কুভাব পোষণ করিতে দেওয়া এক কথা আর মন যদি ইচ্ছার বিরুদ্ধে কুভাবে লীন হয় তো সে আর এক কথা। কু-ভাবনার আনাচ-কানাচে ঘুরিয়া বেড়ানোর ব্যাপারে মনের সহিত সহযোগিতা না করিলে অন্তে আমাদের জয় হইবে।

জীবনের প্রতি মুহূর্তে আমরা দেখিতে পাই যে, দেহ বশে থাকিলেও মন বশে নয়। দৈহিক নিগ্রহে তো শৈথিল্য আদৌ করিতে নাই ; তাহাই যথেষ্ট নহে। সঙ্গে সঙ্গে মনকে বশে আনার নিরন্তর প্রযত্ন করিতে হইবে। ইহার বেশী করা যায় না, কম করিলেও চলে না। যদি মনের বশীভূত হই তো দেহ-মন বিভিন্ন মুখে চলিবে, পরিণাম উহার আত্ম-প্রবঞ্চনা। কুচিন্তা আসিলেই যদি তাহার বিরোধ করিতে থাকি তবে বলা যাইবে যে দেহ ও মন একাভিমুখী হইয়াছে।

ব্রহ্মচর্য পালন করা অতীব কঠিন, প্রায় অসাধ্য এরূপ ধারণা আমাদের পাইয়া বসিয়াছে। ব্রহ্মচর্য শব্দের সংকীর্ণ অর্থ করারই

ইহা ফল। কাম-বাসনাকে বশীভূত করাকে ব্রহ্মচর্যের সমতুল মনে করা হইয়াছে। আমি মনে করি এই ধারণা একাঙ্গী ও অসঙ্গত। ব্রহ্মচর্য বলিতে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ বুঝায়। যে কেবল এক ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করে আর অন্য সব ইন্দ্রিয়কে যথেচ্ছ ছাড়িয়া দেয়, অন্তে সে দেখিবে তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। যে কানে ইঙ্গিতপূর্ণ কাহিনী শোনে, চক্ষে ইঙ্গিতপূর্ণ ছবি দেখে, জিহ্বার লালসায় উত্তেজক দ্রব্য ভক্ষণ করে, হাত দিয়া উত্তেজক পদার্থ স্পর্শ করে আর তাহার পরে মনে করে বাকী ইন্দ্রিয়কে বশে রাখিবে, তাহার আশা আগুনে হাত দিয়া অক্ষত থাকার আশার মতই অলীক। অতএব যে একটি নিগ্রহ করিতে কৃতনিশ্চয় তাহাকে বাকী সব কয়টি নিগ্রহ করিতে হইবে। আমার বরাবর মনে হইয়াছে যে, ব্রহ্মচর্যের সংকীর্ণ অর্থ করাতে খুব ক্ষতি হইয়াছে। সর্বদিকে আত্মসংযমের যুগপৎ বিধিবদ্ধ চেষ্টা করিলে চেষ্টা ফলবতী হইবে। রসনাই সম্ভবত মূল পাপী। অতএব আশ্রমে যে সব ব্রত পালন করা হয়, অস্বাদ-ব্রত উহার অন্যতম।

ব্রহ্মচর্যের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরুন। চর্য মানে আচরণীয়। সুতরাং ব্রহ্মচর্য মানে ব্রহ্মোপলব্ধি বা সত্যোপলব্ধির জন্য আচরণীয় বিধি। এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতে বিশেষ অর্থের—ইন্দ্রিয়গ্রাম নিগ্রহের কথা আসিয়াছে। ব্রহ্মচর্যের ঐ যে অপূর্ণ সংজ্ঞা, যাহা কেবল কামজয়ের কথা বলে, একেবারে ভুলিয়া যাইতে হইবে।

[যারবেদা মন্দির হইতে (১৯৪৫), তৃতীয় অধ্যায়]

৩৫

ব্রহ্মচর্যের ধাপ

প্রথম ধাপ ঃ ইহার প্রয়োজন উপলব্ধি।

দ্বিতীয় ধাপ ঃ ইন্দ্রিয়সমূহের ক্রমিক নিগ্রহ। ব্রহ্মচারীর জিহ্বাকে দমন করিতেই হইবে। জীবন ধারণের জন্য সে খাইবে, ভোগের জন্য নহে। পবিত্র বস্তু সে দেখিবে, অপবিত্র হইতে চক্ষু সরাইয়া লইবে। এদিকে-ওদিকে না তাকাইয়া দৃষ্টি মাটিতে নিবদ্ধ করিয়া চলা মার্জিতরুচিসম্পন্ন গৃহে জন্মানোর লক্ষণ। ব্রহ্মচারী অশ্লীল অপবিত্র কিছু দেখিবে না, তীব্র উত্তেজক কিছু শুঁকিবে না। কৃত্রিম গন্ধদ্রব্য ও নির্যাস হইতে নির্মল মাটির গন্ধ অনেক বেশী মধুর। ব্রহ্মচর্যকামী লোকের হাত-পা সারাদিন উত্তম কার্যে নিযুক্ত থাকা চাই। উপবাসও সময় সময় করা প্রয়োজন।

তৃতীয় ধাপ ঃ সৎসঙ্গ—নির্মলচরিত্র বন্ধু, শুচিশুদ্ধ পুস্তক।

তদুপরন্তু প্রার্থনা তো চাইই। অন্তর ঢালিয়া নিত্যনিয়মিত রূপে রামনাম করিতে হইবে। কৃপাময়ের কৃপা যাচ্ঞা করিতে হইবে।

সাধারণ নরনারীর পক্ষে এর কোনটিই কঠিন নহে। জলের মত সহজ। সহজ বলিয়াই বুঝি তাহা কঠিন। সংকল্প থাকিলে পথ অতীব সহজ। সংকল্প নাই তাই লোকে বৃথাই হাতড়াইয়া মরে। সংসার কমবেশী ব্রহ্মচর্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ইহা হইতে বুঝা যায় ব্রহ্মচর্য আবশ্যক ও অসাধ্য নহে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৯-৪-২৬]

অনেক ব্রহ্মচারী ব্যর্থ হয় তাহার কারণ অন্য সব ইন্দ্রিয়ের

ব্যবহার তাহারা অ-ব্রহ্মচারীদের মত করিতে চায়। অতএব তাহাদের চেষ্টা দারুণ গ্রীষ্মে শীতের বলদায়ী শৈত্য উপভোগের চেষ্টার মত। ব্রহ্মচারী ও অ-ব্রহ্মচারী জীবনের ভেদরেখা সুস্পষ্ট হওয়া চাই। এই দুইয়ের মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখা যায় তাহা ভ্রমমাত্র। ভেদ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। দুইয়েই চোখ দিয়া দেখে : একে দেখে ভগবানের মহিমা, অপরে দেখে আশপাশের শত আবর্জনা। উভয়েই কান দিয়া শোনে : একে শোনে ভগবানের ভজন, অপরে শোনে অশ্লীল তান। দুইয়েই অনেক সময় অধিক রাত পর্যন্ত জাগিয়া থাকে ; একে করে প্রার্থনা, অপরে রাত কাটায় অসংযত হানিকর আমোদ-প্রমোদে। উভয়েই ভিতরের পুরুষকে খাওয়ায় : একে খায় ভগবানের মন্দিরের ক্ষয় পূরণের জন্য, মন্দির কার্যকর রাখার জন্য ; অন্যে গিলে রসনাতৃপ্তির জন্য আর পবিত্র আধারকে বানায় দুর্গন্ধ নরক। তবেই দেখিতেছেন, দুইয়ের চলন-চালনে, ধরন-ধারণে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। আর যত দিন যায় এই ব্যবধান তত বাড়ে।

ব্রহ্মচর্য বলিতে কায়মনোবাক্যে ইন্দ্রিয়গ্রামের নিগ্রহ বুঝায়। উপরে বর্ণিত সংযমের আবশ্যকতার কথা আমি দিন দিন অধিক উপলব্ধি করিয়াছি। পরিহারের মাত্রা যে কতদূর যাইতে পারে তাহার ইয়ত্তা নাই যেমন নাই ব্রহ্মচর্যের। এরূপ ব্রহ্মচর্য যেমন-তেমন চেষ্টায় লভ্য নহে। অধিকাংশের পক্ষে ইহা আদর্শই থাকিয়া যাইবে। ব্রহ্মচর্য-কামী নিজ ত্রুটি সম্বন্ধে সতত জাগরূক, মনের নিভৃতে যে কাম-বাসনা লুকাইয়া আছে তাহা সে খুঁজিয়া বাহির করে ও তাহা হইতে মুক্তি লাভের নিরন্তর চেষ্টা করে। যতদিন মন পূর্ণ বশে না আসে ততদিন পূর্ণ ব্রহ্মচর্য লাভ হয় না। মনোবিকার হইতে অবাঞ্ছিত চিন্তা জন্মে ; সুতরাং চিন্তা-নিগ্রহ মানে মনোনিগ্রহ : মনোনিগ্রহ বায়ু-নিগ্রহ অপেক্ষাও দুরূহ। তা হইলেও ভগবান অন্তরে বিরাজিত বলিয়া মনকে

বশ মানানো সম্ভবপর। কঠিন বলিয়া উহা অসম্ভব এ কথা যেন কেহ মনে না করেন। ইহা অন্তিম লক্ষ্য ; অন্তিম লক্ষ্য প্রাপ্তির জন্য অন্তিম প্রয়াস করিতে হয়।

কিন্তু ভারতে ফিরিয়া আসার পরে আমি বুঝিতে পারি যে, কেবল মানুষের চেষ্টায় এরূপ ব্রহ্মচর্য লাভ সম্ভব নহে। ইহার পূর্ব পর্যন্ত এই ভ্রান্ত ধারণা আমার ছিল যে কেবল ফলাহারেই সমস্ত ইন্দ্রিয় বশ মানিবে এবং অভিমানভরে ভাবিতাম আর কোন কিছু করার দরকার নাই।

কিন্তু আমার সংগ্রামের কাহিনীর বর্ণনা যথাস্থানে করিব। ইতোমধ্যে এখানে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া লই যে, যাহারা ঈশ্বরোপলব্ধির জন্য ব্রহ্মচর্য পালন করিতে চায় তাহাদের হতাশ হওয়ার কিছু নাই, নিজ নিজ ঐকান্তিক প্রযত্নের তুল্যই যদি তাহাদের ভগবানে বিশ্বাস হয়।

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে॥

ভোগ দূর হয়ে যায় নিরাহারী দেহীদের
রস কিন্তু নাহি যায়, যায় তাহা আত্মলাভে।

অতএব তাঁর নাম ও তাঁর কৃপাই মোক্ষকামীর শেষ আশ্রয় ও ভরসা। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পরেই কেবল এই সত্য আমি উপলব্ধি করি।

[আত্মকথা (১৯৪৮), পৃঃ ২৫৮-২৬০]

শারীর ব্রহ্মচর্যের পালনও আমার পক্ষে দুশ্চর হইয়াছিল। এখন বলিতে পারি যে আমি পূর্ণ নিরাপদ বোধ করি কিন্তু মন এখনও পূর্ণ বশে আসে নাই। তাহা একান্ত দরকার। সংকল্প বা

প্রযত্ন শিথিল তাহা নয় কিন্তু কোথা হইতে যে অবাঞ্ছিত চিন্তার অতর্কিত আক্রমণ হয় তাহা আমার এক সমস্যা। অবাঞ্ছিত চিন্তা নিরোধের পন্থা নিশ্চয়ই আছে কিন্তু তাহা প্রত্যেকের নিজের নিজের মত খুঁজিয়া লইতে হয়। সাধু ও দ্রষ্টা পুরুষদের অভিজ্ঞতা আমাদের সামনে রহিয়াছে কিন্তু তাঁহারা কোন অব্যর্থ ও সর্বসামান্য পন্থা আমাদের দেখান নাই। কারণ পূর্ণতা বা নির্ভুলতা একমাত্র ভগবৎ-প্রসাদেই লাভ হয়। তাই সাধকেরা তাঁহাদের তপশ্চর্যাপূত ও পবিত্রতায় অভিমন্ত্রিত রামনামের মত মন্ত্র আমাদের দিয়া গিয়াছেন। পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া ভগবানের কৃপা-ভিখারী না হইলে চিন্তা পূর্ণ বশে আসে না। ইহা যে কোন মহান্ ধর্মগ্রন্থের শিক্ষা আর পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের সাধনাক্রমে এই কথার সত্যতা আমি জীবনের প্রতিক্ষণ অনুভব করিতেছি।

[আত্মকথা (১৯৪৮), পৃঃ ৩৮৮]

ভগবানে তথা সত্যে জ্বলন্ত বিশ্বাস বিনা ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করা যায় না এ কথা আমায় স্বীকার করিতেই হইবে। ভগবান-ফগমান আমরা মানি না এ কথা বলা, সাক্ষাৎ ভগবানে জ্বলন্ত বিশ্বাস বিনাই জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ হইতে পারে এ কথা বলা আজকাল রেওয়াজে দাঁড়াইয়াছে। যাঁহারা নিজেদের অপেক্ষা অনন্ত ঐশ্বর্যশালী কোন শক্তিতে আস্থাবান নহে, যাহারা সেই প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না, এই ধর্ম আমি তাহাদের কি করিয়া বুঝাইব? তাহা আমার সাধ্যের অতীত, এ কথা স্বীকার করিতে আমার লজ্জা নাই। অভিজ্ঞতা হইতে এই জ্ঞান আমার জন্মিয়াছে যে, যে ক্রিয়মাণ বিধির নিয়ন্ত্রণে বিশ্ব চলে তাহার উপর অবিচল বিশ্বাস ব্যতীত পরিপূর্ণ জীবন লাভ করা যায় না। যাহার সেই বিশ্বাস নাই, মহাসমুদ্র হইতে তীরে বিক্ষিপ্ত জলবিন্দুর মতই তাহার বিনাশ অনিবার্য।

মহাসাগরের প্রতি জলবিন্দু মহাসাগরের ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান এবং উহার সঞ্জীবনী শক্তির শক্তিতে শক্তিমান।

[হরিজন, ২৫-৪-৩৬]

৩৬

বিবাহ-ধর্মানুষ্ঠান

মানুষ শিল্পী, মানুষ স্রষ্টা এ বিষয়ে সংশয় নাই। রূপ আর তাই রঙ না হইলে তাহার চলে না। তাহার পরম বিকশিত শিল্পানুভূতি ও সৃজনী প্রতিভা মানুষকে বাছ-বিচার করিতে শিখাইয়াছে আর শিখাইয়াছে তাহাকে এ কথা বুঝিতে যে, রঙের সমাবেশমাত্রই সৌন্দর্য নহে আর সুখাবহ বলিয়াই যে কোন সুখানুভূতি শ্রেয়স্কর নহে। শিল্পবোধের প্রেরণায় মানুষ কার্যকারিতায় সুখানুসন্ধান করিতে শিখিয়াছে। উদাহরণার্থ, ক্রমবিকাশের কোন এক আদি যুগেই মানুষ বুঝিতে পারিয়াছিল যে খাওয়ার জন্যই—আজও কেহ কেহ যেমন করে—খাইতে নাই, খাইতে হয় জীবন রক্ষার জন্য। অভিব্যক্তির আর এক স্তরে সে এ কথাও বুঝিতে পায় যে, কেবল নিজেকে লইয়া ব্যস্ত থাকাতে সুখ বা সৌন্দর্য নাই, জীবনের সার্থকতা লোকের সেবায় আর লোকসেবার ভিতর দিয়া বিধাতার সেবায়। তদ্রূপ, যখন সে সহবাসের রহস্যাবৃত সুখানুভূতির বিষয় চিন্তা করিতে থাকে তখন দেখিতে পায় যে, অন্যান্য বাহেন্দ্রিয়ের ন্যায় জননেন্দ্রিয়েরও ব্যবহার ও অপব্যবহার দুইই হইতে পারে। পরে সে এ কথাও বুঝিতে পারে যে, প্রজননের জন্য ব্যবহারই উহার

একমাত্র ধর্মসঙ্গত ব্যবহার, অন্য কোন ব্যবহার অশোভন। আর মানুষ এ কথাও বুঝিতে পারে যে, উহার অশোভন ব্যবহারের পরিণাম কি ব্যক্তি কি সমাজ উভয়ের পক্ষেই হানিকর হইতে পারে।

[হরিজন, ৪-৪-৩৬]

সমাজ সতত আগাইয়া চলিয়াছে। অধ্যাত্মের ভাষায় বলিতে গেলে, উহার নিরন্তর বিকাশ হইতেছে। এ কথা সত্য হয় তো দেহের ক্ষুধাকে উত্তরোত্তর অধিক অঙ্কুশাধীন করার ভিত্তিতে সমাজকে গড়িতে হইবে। সুতরাং বিবাহ এক ধর্মানুষ্ঠান; স্বামী-স্ত্রীকে তাহা সংযমের ডোরে বাঁধে, পরস্ত্রীপরপুরুষ-গমন নিষেধ করে এবং বলে যে স্বামী-স্ত্রী দুইয়েরই যদি সন্তানবাসনা জন্মে তবেই কেবল সহবাস করা যাইবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৬-৯-২৬]

জন্মশাসন সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। আত্মসংযম বা ব্রহ্মচর্য সেই পথ; পুরাকাল হইতে তাহা চলিয়া আসিয়াছে। যাহারা তাহা পালন করে তাহাদের পক্ষে তাহা অব্যর্থ ফলপ্রদ ও হিতকর। জন্মনিয়ন্ত্রণের কৃত্রিম উপায় উদ্ভাবন না করিয়া চিকিৎসকগণ যদি আত্মসংযমের পথ লোককে দেখায় তো তাহারা মানুষের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১২-৩-২৫]

কৃত্রিম উপায়ের শরণ লইলে পাপে ইন্ধন যোগানো হইবে। উহার ফলে নর-নারী বেসামাল হইবে। এই সব কৃত্রিম উপায়কে পাংক্তেয় করিলে (যেমন করা হইতেছে) লোকমত যে সংযমের বাঁধ সৃষ্টি করিয়াছে তাহা ভাসিয়া যাইবে। তার ফলে মানুষের বুদ্ধি

ম্লান হইবে, শরীর তাহার স্নায়বিক দৌর্বল্যে জীর্ণ হইবে। সমস্যা অপেক্ষা সমাধান অধিক ভয়াবহ হইবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১২-৩-২৫]

কর্মের ফল এড়ানোর চেষ্টা অনুচিত ও অনৈতিক। বেশী খাইয়াছ, মাথা ধরিয়াছে; সে তো ভালই, উপবাস কর। অতিরিক্ত ভোজনের কুফল হইতে বাঁচার জন্য রসায়ন বা ঔষধ খাওয়া ভাল নয়। যথেচ্ছ কামোপভোগ করিয়া উহার পরিণাম হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার চেষ্টা ততোধিক মন্দ। প্রকৃতি বড় নিষ্ঠুর। সয় যেমন লয়ও তেমন। নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছ তো সে ষোল-আনা প্রতিশোধ লইয়া ছাড়ে। নৈতিক সংযমেই কেবল নৈতিক ফল মিলে। অন্য সব নিগ্রহের উল্টা ফল হয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১২-৩-২৫]

জগতের স্থিতির মূলে প্রজনন-ক্রিয়া। জগৎ ভগবানের লীলা-ক্ষেত্র, তাঁর মহিমার প্রতিবিম্ব; তাই উহার সুব্যবস্থিত বিকাশের জন্য প্রজনন-ক্রিয়া অঙ্কুশাধীন হওয়া চাই।

[আত্মকথা (১৯৪৮), পৃঃ ২৫১]

যৌন-প্রেরণা উত্তম ও দিব্য বস্তু। ইহাতে লজ্জার কিছু নাই। কিন্তু একমাত্র প্রজননের জন্যই উহা উদ্দিষ্ট। অন্যথাচরণ করিলে ভগবানের বিধি ও মানবধর্ম লঙ্ঘন করা হয়।

[হরিজন, ২৮-৩-৪৬]

অবাঞ্ছিত সন্তানের জন্মদান পাপ। কিন্তু আমার মতে কৃত কর্মের ফল এড়ানো আরও বড় পাপ। উহার ফলে মানুষ অমানুষ হয়।

[হরিজন, ৭-৯-৩৫]

উন্নতি-অবনতি দুই পথ মানুষের সামনে খোলা ; উহার একটা তাহাকে বাছিয়া লইতে হইবে। কিন্তু মানুষে পশুত্ব আছে বলিয়া উর্ধ্বারোহণের পথ অপেক্ষা অধঃপতনের পথ সে সহজে বাছিয়া লইবে, বিশেষত অধোগমনের পথ যদি সুগম ও মনোহর রূপে সামনে ধরা হয়। পাপকে পুণ্যের বেশ দিলে লোকে সহজেই ভোলে আর মেরি স্টোপ্‌স প্রভৃতি সেই কার্যটি করিতেছেন।

[হরিজন, ৩১-১-৩৫]

৩৭

অপরিগ্রহ ব্রত

সত্যের সাধক, প্রেমধর্মের পথিক আগামী কালের জন্য কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে না। ভগবান আগামী কালের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখেন না। তিনি দিনানুদৈনিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু সৃষ্টি করেন না। অতএব হিতাকাঙ্ক্ষী ভগবানের উপর যদি আমরা নির্ভর করি তবে দিনের আহার (অর্থাৎ যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা) তিনি দিন যোগাইবেন এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। যে ভাগবত বিধি দিনের আহার দিন যোগায় তাহা মানি না বা তাহার উল্টা আচরণ করি বলিয়া যত বৈষম্যের ও বৈষম্যজনিত দুঃখের সৃষ্টি হয়। ধনীর ঘরে জিনিস আঁটে না, অবহেলায় অপচয় হয় ; ওদিকে গরীবের ঘরে উনুন জ্বলে না, অনাহারে সে মরে। কেহ যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু না রাখিত তবে কাহারও অভাব হইত না ; সকলে সন্তুষ্ট থাকিত। আজ তো ধনীও অসন্তুষ্ট, গরীবও অসন্তুষ্ট। গরীব স্বপ্ন দেখে সে লাখোপতি হইবে ; ধনীর চেষ্টা সে কুবেরের ধন আহরণ করিবে। ভর-পেট খাইতে পাইলেও গরীব সব

সময় তুষ্ট নয়, কিন্তু ভর-পেট খাইতে পাওয়ার দাবি নিশ্চিত তাহার আছে আর সে দাবি পূরণ করা সমাজের অবশ্য কর্তব্য। যে অবস্থায় সর্বত্র সন্তোষ বিরাজ করিবে সে অবস্থা আনয়নের জন্য ধনীদের অগ্রণী হইতে হইবে। ধনীরা যদি অতি আহরণে বিরত হয় তবে পেটের অন্ন গরীবদের পক্ষে সুলভ হইবে। আর ধনীর সঙ্গে তখন গরীবও সন্তোষের শিক্ষা লাভ করিবে। পূর্ণ অপরিগ্রহী হইতে হইলে মানুষের কল্যকার আশ্রয় আবরণ ও অন্নের বিষয়ে পাখির মত নির্বিকার হইতে হইবে। পেটের অন্ন অবশ্য প্রতিদিন চাই কিন্তু তাহা সঞ্চয় করিয়া রাখা তাহার দায় নয়, সে ব্যবস্থা করার দায় ভগবানের। কিন্তু এই আদর্শে পেঁৗছানো দুই-চার জন জ্ঞানী পুরুষের পক্ষেই কেবল সম্ভব। সাধারণ সাধক আমাদের কর্তব্য হইবে ঐ আদর্শ সতত সামনে রাখা ও তদনুযায়ী সঞ্চয় কতটা করিয়াছি তাহা বিচার করিয়া দেখা এবং দিন-দিন তাহা কমানোর চেষ্টা করা। যথার্থ সভ্যতার পরিমাপ অভাব বৃদ্ধিতে নয়, বিচার-পূর্বক স্বেচ্ছায় অভাব সংকোচনে, কারণ উহাই সুখ ও সন্তোষ এবং সেবাশক্তি বৃদ্ধির উপায়। অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করিলে মানুষ অভাব কমাইতে পারে আর অভাব কমাইলে সুখ (সুস্থ দেহ ও তুষ্ট মন) লাভ হয়। নির্ভাজ সত্যের দৃষ্টিতে দেখিলে এই দেহটাও এক সম্পত্তি—আত্মার আহৃত সম্পত্তি। ভোগ-তৃষ্ণা হেতু এই দেহরূপ অন্তরায় আমরা সৃষ্টি করিয়াছি ও রক্ষা করিয়া চলিয়াছি। বাসনার অন্ত হইলে এই দেহের আবশ্যকতা আর থাকে না ; মানুষ তখন অসার জন্ম-মৃত্যুর ফের হইতে নিষ্কৃতি পায়। আত্মা সর্বব্যাপী। কোন্ গরজে সে দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ হইতে যাইবে আর কেনই বা এই পিঞ্জরের জন্য সে অপকর্ম করিতে, হত্যার মত জঘন্য পাপকর্ম করিতে যাইবে ? এভাবে আমরা ত্যাগের পূর্ণ আদর্শে পেঁৗছিয়া যাই এবং যতদিন দেহ পাত না হয় ততদিন উহাকে সেবার

নিমিত্তরূপে ব্যবহার করিতে শিখি—এতদূর পর্যন্ত যে, আহার নয় সেবাই তখন জীবনের অবলম্বন হইয়া দাঁড়ায়। আমরা আহার-পান করি, ঘুমাই-জাগি, সেও সেবার নিমিত্তেই। তাহা হইতে আনন্দ লাভ হয় আর অন্তে পরা-দর্শন। আসুন, এই দৃষ্টিতে আমরা আমাদের বিত্তের বিচার করি।

অপরিগ্রহের নীতি যেমন বস্তুর পক্ষে তেমন ভাবের পক্ষেও প্রযোজ্য। যে মানুষ অপ্রয়োজনীয় বিদ্যা দিয়া মগজ ভর্তি করে সে এই অমূল্য ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে। যে ভাব আমাদিগকে ভগবান-বিমুখী করে অথবা ভগবানের অভিমুখী করে না তাহা প্রতিবন্ধক; যত শীঘ্র তাহা ভোলা যায় তত মঙ্গল। প্রসঙ্গত ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জ্ঞানের যে সংজ্ঞা গীতা দিয়াছে তাহা চিন্তা করিয়া দেখার যোগ্য। নম্রতা (অমানিত্বম্) ইত্যাদিকে জ্ঞান বলা হইয়াছে ; তা বাদে সব কিছু অজ্ঞান। এ কথা যদি ঠিক হয়—আর ঠিক তো বটেই—তবে অনেক কিছু যাহা আমরা জ্ঞান বলিয়া আহরণ করি, নিছক অজ্ঞান বই আর কিছুই নয় ; উহা ভাল না করিয়া করে মন্দ। উহার ফলে মন ব্যর্থ দৌড়াদৌড়ি করে, অন্তঃসারশূন্য হইয়া যায় আর অশুভের অনন্ত আকর্ষণে চিত্ত অসন্তোষে ভরিয়া ওঠে। ভুল করিবেন না। নিষ্ক্রিয়তার স্তুতি ইহা নয়। জীবনের প্রতি মুহূর্ত কর্মময় হওয়া চাই কিন্তু সে কর্ম হইবে সত্যানুসন্ধী সাত্ত্বিক কর্ম। সেবায় যাহার জীবন সমর্পিত সে ক্ষণকালও অলস থাকিতে পারে না। কিন্তু কর্ম ও অকর্মের ভেদ বোঝা চাই। এই বাছ-বিচার একাগ্র সেবার সহচর।

[যারবেদা মন্দির হইতে, ষষ্ঠ অধ্যায়]

অতএব সব কিছু ত্যাগ কর, ভগবানে তাহা অর্পণ কর আর কর্ম করিয়া চল। ইহার অর্থ, বাঁচিয়া থাকার অধিকার জন্মে ত্যাগে।

"অন্য সবে নিজ নিজ কর্তব্য করলে আমিও আমারটা করব,"— এ কথা ইহা বলে না। ইহা বলে,—"অন্যে কি করে আর করে না সে দিকে তাকিও না, তোমারটা তুমি কর; বাকী সব ভগবানের উপর ছাড়।"

[হরিজন, ৬-৩-৩৭]

যীশু মহম্মদ বুদ্ধ নানক কবীর চৈতন্য শঙ্কর দয়ানন্দ রামকৃষ্ণ— হাজারো লোকের উপর নৈতিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাদের জীবনের গতি ঘুরাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের আবির্ভাবে ধরা সমৃদ্ধতর হইয়াছে। আর তাঁহারা সকলেই বিচারান্তে দারিদ্র্য বরণ করিয়াছিলেন।

[স্পীচেস অ্যাণ্ড রাইটিংস অব মহাত্মা গান্ধী (১৯৩৩), পৃঃ ৩৫৩]

অগণিত লোকের যাহা জোটে না তাহা কোনমতেই লইব না— ইহাই সর্বোত্তম রীতি। ত্যাগের এই সামর্থ্য আচমকা আমাদের লাভ হইবে তাহা নয়। অগণিত লোকের ভাগ্যে যাহা জোটে না তাহা না নেওয়ার বৃত্তি আগে সাধিতে হইবে আর উহার অব্যবহিত পরেকার কাজ হইতেছে ঐ বৃত্তি অনুসারে যতদূর সম্ভব নিজ জীবন ঢালিয়া সাজা।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৪-৬-২৬]

আজিকার কথা যদি আমরা ঠিক ঠিক ভাবি তাহা হইলে কল্যকার কথা ভগবান ভাবিবেন।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৩-১০-২১]

৩৮

কর্ম নয় তো পূজা

যজ্ঞ-সহিত প্রজা সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মা বলিলেনঃ "এ যজ্ঞ দ্বারা তুমি বৃদ্ধি পাবে। এর দ্বারা তুমি ইষ্ট লাভ করবে।" যজ্ঞ না করিয়া যাহারা খায় তাহারা চৌর্যান্ন গ্রহণ করে, গীতা এ কথা বলে। বাইবেল বলেঃ "মেহনত করে উদরান্নের সংস্থান কর।" যজ্ঞ নানা রকমের। উহাদের একটি অন্নশ্রম (ব্রেড লেবর)। সকলে যদি অন্নসংস্থানের জন্য খাটিত (আর কিছু না-ও করিত) তবে কাহারও আহারের ও আরামের অভাব হইত না। সে স্থলে লোকাধিক্যের কথা উঠিত না, এত ব্যাধি ও এমন দুঃখ-দৈন্য থাকিত না। এই শ্রমই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। লোকে অবশ্য দেহ ও মন দিয়া অন্য নানা কাজ করিবে তবে সে-সব হইবে সাধারণের হিতার্থে কৃত প্রেম-কর্ম। তখন ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য থাকিবে না।

[হরিজন, ২৯-৬-৩৫]

হয়তো বা ইহা অপ্রাপ্য আদর্শ। তাহা বলিয়া চেষ্টায় নিরস্ত হইলে চলিবে না। যজ্ঞধর্ম তথা জীবনধর্ম পুরোপুরি পালন না করিয়াও যদি নিত্যকার উদরান্নের জন্য পর্যাপ্ত শরীর-শ্রম করি তাহা হইলেও আদর্শের দিকে অনেক দূর অগ্রসর হইব।

[হরিজন, ২৯-৬-৩৫]

এইরূপ করিলে আমাদের অভাব যতদূর সম্ভব কমিয়া যাইবে এবং আহার হইবে সাদাসিধা। না খাইলে নয় বলিয়া তখন খাইব,

খাওয়ার জন্য খাইব না। আমাদের এই কথার সত্যতায় যাঁহারা সন্দিহান তাঁহারা শরীর-শ্রমে অন্নোৎপাদন করিয়া দেখুন, নিজ উৎপন্ন দ্রব্য হইতে তাঁহারা পরম পরিতোষ লাভ করিবেন, স্বাস্থ্যোন্নতি হইবে, এবং দেখিতে পাইবেন যে অনেক বস্তু যাহা না হইলে চলিত না, একান্তই অবান্তর।

[হরিজন, ২৯-৬-৩৫]

মানসিক শ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জন করা চলে কি ? না। দেহের জন্য যাহা আবশ্যক দেহ দিয়াই তাহা পূরণ করিতে হইবে। 'ভূত-দেহের পাওনা ভূতদেহকে দাও' এ কথা এই প্রসঙ্গে বলা চলে। নিছক মানসিক অর্থাৎ বৌদ্ধিক শ্রম তাহা তো আত্মোন্নতির জন্য ; নিজেতেই নিজে তাহা তৃপ্ত। পারিশ্রমিকের দাবি করা তাহার সাজে না। আদর্শ সমাজব্যবস্থায় চিকিৎসক, ব্যবহারজীবী প্রভৃতি আত্মকল্যাণের জন্য নয়, সমাজকল্যাণের জন্যই কেবল কাজ করিবে।

অন্ন-শ্রমের ধর্ম পালন করিলে অগোচরেই সমাজব্যবস্থায় এক বিপ্লব সাধিত হইবে। জীবনসংগ্রামের স্থান যখন জীবসেবা গ্রহণ করিবে তখন মানুষের জয়জয়কার হইবে—পশুধর্ম তখন মানবধর্মে রূপান্তরিত হইবে।

[হরিজন, ২৯-৬-৩৫]

অন্ন-শ্রমের তাৎপর্য অনুসারে জীবন ঢালিয়া সাজানোর নাম গ্রামে ফিরিয়া যাওয়া।

[হরিজন, ২৯-৬-৩৫]

যে লোক মানবের সেবা করে ভগবান নিজ গরজে তাহার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন। যেমন হইয়াছিলেন আবু বেন আদমের হৃদয়ে।

আবু বেন লোকসেবা করিয়াছিলেন তাই ভগবানের সেবকদের নামের তালিকার শীর্ষে তাঁহার নাম ছিল।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৪-৯-২৫]

কিন্তু দুঃখী ও দুর্দশাগ্রস্ত কাহারা? দলিত ও অন্নহীন যাহারা। অতএব দেহ মন ও আত্মা দ্বারা তাহাদের সেবা করিলেই ভক্ত হওয়া যাইবে, অন্যথায় নয়। গরীবের দুঃখ উপশমের জন্য যে সুতা পর্যন্ত কাটে না, উল্টা অজুহাত দেখায়, সেবার মানে যে কি তাহা সে জানে না। যে গরীবদের কাছে গিয়া সুতা কাটে ও তাহাদের কাটিতে বলে সে ভগবানের অনন্য ভক্ত। ভগবান গীতায় বলেনঃ "পত্র পুষ্প ফল জলের মত তুচ্ছ জিনিসও যদি ভক্তিভাবে কেউ দেয় তো আমি গ্রহণ করি।" 'দীন অধম পতিত' এদেরই দেন ভগবান চরণে স্থান। অতএব তাহাদের জন্য সুতা কাটাই সর্বোত্তম প্রার্থনা পূজা ও যজ্ঞ।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৪-৯-২৫]

প্রশ্ন ঃ যে সময়টা ভগবৎপূজায় যায় সে সময়টা গরীবের সেবায় দিলে আরও ভাল হয় না কি? আর যে প্রকৃত সেবা করে তার পক্ষে পূজা-আরাধনার দরকার আছে কি?

উত্তর ঃ দুইটা জিনিসের আভাস এই প্রশ্নে আছে—এক, মানসিক জড়তা আর দুই, নাস্তিকতা। পরম যে কর্মযোগী সেও কখন ভজন গাহিতে বা পূজা করিতে বিরত হন নাই। ভাবরাজ্য হইতে দেখিলে বলা চলে যে, প্রকৃত জনসেবাই দেবপূজা আর এরূপ ভক্তের পূজা ইত্যাদিতে সময় ব্যয় না করিলেও চলে। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে দেখিলে ভজনাদি প্রকৃত সেবার সহায়ক; ভগবানের কথা তাহাতে ভক্তের হৃদয়ে সদাজাগরূক থাকে।

[হরিজন, ১৩-১০-৪৬]

ভগবানের নামে কৃত ও তাঁকে সমর্পিত কোন কর্মই লঘু নহে। সমর্পণভাব হইতে কৃত সর্ব কর্ম তুল্যমূল্য। যে মেথর ভগবানের পূজাজ্ঞানে তাহার কর্তব্য করে আর যে রাজা তাহার জ্ঞানগরিমা ভগবানের ন্যাসীরূপে লোকসেবায় লাগায়—এই দুইয়ের কর্মের মূল্য সমান।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৫-১১-২৬]

যে শরীর শ্রম না করিয়া গরীবদের চারা নাই সেই শরীর শ্রমের কাজ যদি ধরুন আমরা সবে প্রতিদিন এক ঘণ্টা করি আর ঐ কাজের ভিতর দিয়া তাহাদের তথা মানবগোষ্ঠীর সহিত সমসূত্রে যুক্ত হই তো তাহা অপেক্ষা উন্নততর ও অধিক দেশহিতকর কার্য আর কি হইতে পারে আমি ভাবিয়া পাই না। গরীবেরা যে দৈহিক শ্রম করে ভগবদ্‌-সেবা জ্ঞানে তাহাদের জন্য সেই দৈহিক শ্রম করি তো তাহা অপেক্ষা ভগবানের প্রকৃষ্ট পূজা আর কি হইতে পারে?

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২০-১০-২১]

কর্মের উপর যত জোরই দিন তবু তাহা কম। গীতা ভগবানের মুখে যে নীতি ব্যাখ্যা করিয়াছে আমি তাহারই পুনরাবৃত্তি করিতেছি মাত্র: "আমি যদি অতন্দ্রিতভাবে কর্মে সতত রত না থাকি তবে মনুষ্যলোকে আমি কুদৃষ্টান্ত স্থাপন করব।"

[হরিজন, ২-১১-৩৫]

যত দিন সুস্থ-সবলদেহ কোন নর বা নারী কর্মাভাবে অলস বা অনাহারে থাকিবে ততদিন কোন্ লজ্জায় আমরা নিরস্ত হইব, কোন্ লজ্জায় ভর-পেট খাইব?

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৬-১০-২১]

প্রেমের বা অহিংসার প্রেরণা বিনা সেবা করা যায় না। প্রকৃত প্রেম মহাসাগরের মত সীমাহীন; অন্তরে উহার তরঙ্গ জাগে, উদ্বেলিত হয় আর দেশ-দেশান্তরের সীমা অতিক্রম করিয়া তাহা বিশ্ব-ব্যাপ্ত হয়। গীতায় যজ্ঞ বলিয়া বর্ণিত অন্ন-শ্রম ব্যতীত এই সেবা সম্ভব নহে। সেবার্থে শরীর-শ্রম করিলেই কেবল নরনারী আমাদের জীবন ধারণের অধিকার জন্মে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২০-৯-২৮]

৩৭

সর্বোদয়

দেহ দ্বারা ভূতমাত্রের সেবা করিব তাই না ভগবান এই দেহ আমাদের দিয়াছেন। আর তাই তো গীতা বলে "যজ্ঞ* না করে যে খায় সে চৌর্যান্ন গ্রহণ করে।" শুদ্ধ জীবন যে যাপন করিতে চায় তাহার সকল ক্রিয়া যজ্ঞার্থে হওয়া চাই। আমরা জন্মাইবার সঙ্গে যজ্ঞ আমাদের সাথে আসে, সারা জীবনটাই সুতরাং আমরা ঋণী। অতএব জগতের সেবা করার দায় আমাদের মাথার উপর চাপানো। ক্রীতদাস তাহার প্রভুর কাছ হইতে ভাত-কাপড় ইত্যাদি পায়; আমাদেরও তেমন বিশ্ব-বিধাতা যাহা দেন কৃতজ্ঞচিত্তে তাহা গ্রহণ করা কর্তব্য। যাহা কিছু পাই, মনে করিতে হইবে তাহা দান-

* যজ্ঞ বলিতে কি বুঝায় পূর্ববর্তী এক অনুচ্ছেদে গান্ধীজী তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "পার্থিব বা পারলৌকিক কোনরূপ বাসনা না রাখিয়া পরহিতার্থে কৃত কর্ম যজ্ঞ। 'কর্ম' এখানে ব্যাপকতম—'কায়মনোবাক্যে' অর্থে ব্যবহৃত। 'পর' বলিতে কেবল মানুষ নয়, জীবমাত্র বুঝায়। সুতরাং অহিংসার দৃষ্টিতে লোকহিতার্থে হইলেও মনুষ্যেতর জীবের বলিদান যজ্ঞ নহে।"

স্বরূপ পাই, কারণ ঋণ পরিশোধ করাতে পাওয়ার দাবি জন্মে না। কর্মের বিনিময়ে যদি কিছু না পাই তো প্রভুর দোষ দিলে চলিবে না। এই দেহ তাঁর ; তিনি চাহেন তো তাহা পুষিতে হইবে, না চাহেন তো ফেলিয়া দিতে হইবে। ভগবানের যোজনায় আমাদের স্থান কোথায় এ কথা বুঝিলে দেখা যাইবে যে, এখানে অভিযোগ বা আপসোসের কিছু নাই বরং এই ব্যবস্থাই স্বাভাবিক ও মধুর। "ঝঞ্ঝাট নিজে পোয়াতে যাও কেন! চাপিয়ে দাও তাঁতে।"—দেখিতে পাই ইহাই সকল ধর্মের নির্দেশ।

এতে ভয় পাওয়ার কিছু নাই। যে লোক শুদ্ধচিত্তে সেবায় আত্মনিয়োগ করিবে সে সেবার প্রয়োজনীয়তা দিন দিন অধিক উপলব্ধি করিবে এবং তাহার বিশ্বাস সতত দৃঢ় হইতে থাকিবে। যে আত্মস্বার্থে জলাঞ্জলি দিতে, জীবনের উদ্দেশ্য (আমরা ঋণের বোঝা লইয়া জন্মি। সেই ঋণ পরিশোধ করা আমাদের ধর্ম এই কথা) স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে তাহার পক্ষে সেবার পথ আশ্রয় করা প্রায় অসম্ভব। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কোন না কোন সেবাকর্ম তো আমরা সকলেই করি। তাহা বিচারপূর্বক সজ্ঞানে করিলে সেবাস্পৃহা দিন দিন পুষ্ট হইবে আর তাহার ফলে আমরা নিজেরা তো সুখী হইবই সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়াও সুখী হইবে।

[যারবেদা মন্দির হইতে, চতুর্দশ অধ্যায়]

অহিংসার সাধক উপযোগবাদীদের সূত্রে (সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক সুখবিধান) সায় দিতে পারে না। সে সকলের সর্বাধিক সুখ বিধানের প্রযত্ন করিবে এবং ঐ আদর্শ প্রাপ্তির জন্য প্রাণপাত করিবে। ইহার অর্থ, অন্যেরা যাহাতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে তাহার জন্য সে মৃত্যু বরণ করিবে। নিজে মরিয়া সে অন্যের সেবার সঙ্গে আত্মসেবাও করিবে। সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক হিত সর্ব লোকের

সর্বাধিক হিতের অংশ, তাই কর্মজীবনের অনেক ক্ষেত্রে সত্যের সাধক ও উপযোগবাদী এই দুইয়ের মিলন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু একটা সময় আসে যখন তাহারা বিভিন্ন পথে এমনকি বিপরীত পথেও চলে। উপযোগবাদী কখনও আত্মবলি দিবে না কেন না সে উপযোগবাদী।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৯-১২-২৬]

কোন লোক আধ্যাত্মিক জীবনে আগাইয়া গিয়াছে আর তাহার আশপাশের লোকেরা পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে এমনটা আমি বিশ্বাস করি না। আমি অদ্বৈতে বিশ্বাসী। আমি বিশ্বাস করি, মানুষ তথা সর্ব জীব মূলত এক। অতএব আমি বিশ্বাস করি, কোন লোকের আধ্যাত্মিক উন্নতি হইলে তাহার সঙ্গে সমস্ত জগত উন্নত হয় আর কোন লোকের পতন ঘটে তো তামাম দুনিয়ার ততটাই পতন ঘটে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৪-১২-২৪]

এমন কোন সদ্‌গুণ নাই যা কেবল ব্যষ্টির হিত চায় আর তাহাতেই সন্তুষ্ট। উল্টা এমন কোন দুরাচার নাই যাহা দুরাচারী ছাড়া অপর অনেককেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্পর্শ না করে। সুতরাং কোন লোকের সদাচারিতা বা কদাচারিতা একমাত্র তাহার নিজেরই ব্যাপার নয়, গোটা সমাজের তথা সমস্ত জগতেরও তাহা ব্যাপার।

[নৈতিক ধর্ম (ইথিক্যাল রিলিজিয়ন), ১৯২৭, পৃঃ ৫৫]

নম্রতা ছাড়া সেবাময়তা আসে না। যে অন্যের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিবে তাহার নিজের কথা ভাবিবার অবসর বস্তুত কোথায়! নিষ্ক্রিয়তাকে যেন নম্রতা বলিয়া ভুল না করি। হিন্দুধর্মে তাহাই করা

হইয়াছে। প্রাণপণ যত্নে সর্বক্ষণ মানুষের সেবায় রত থাকার নাম যথার্থ নম্রতা। মুহূর্তমাত্র বিশ্রাম না করিয়া ভগবান নিরন্তর কার্য করিয়া চলিয়াছেন। তাঁর সেবা করিতে চাই, তাঁতে লীন হইতে চাই তো আমাদের কর্ম তাঁরই মত অতন্দ্রিত হওয়া আবশ্যক।

[যারবেদা মন্দির হইতে, দ্বাদশ অধ্যায়]

সমুদ্র হইতে বিচ্ছিন্ন জলবিন্দুর ক্ষণিকের বিরাম মিলিতে পারে কিন্তু সমুদ্রে স্থিত বিন্দুর বিরাম নাই। আমাদের সম্বন্ধেও সে কথা। মহাসাগররূপী ভগবানে বিলীন হইয়া গেলে বিরাম থাকে না। আর বস্তুত বিরামের আবশ্যকতাও তখন থাকে না। আমরা যে ঘুমাই তাহাও ক্রিয়া। কারণ ভগবানের কথা অন্তরে ভাবিতে ভাবিতে আমরা ঘুমাইয়া পড়ি। এই বিরামহীনতাই বাস্তব বিরাম। এই বিরামহীন অস্থিরতাই অনির্বচনীয় সন্তোষের উৎস। পূর্ণ সমর্পণের এই অন্তিম দশা কথায় বর্ণনা করা যায় না কিন্তু মানুষের অনুভবের অতীত তাহা নয়। অনেক তদ্‌গতচিত্ত ব্যক্তি সেই অবস্থায় পেঁাছিয়াছেন আর আমাদের পক্ষেও তাহা অলভ্য নয়।

[যারবেদা মন্দির হইতে, দ্বাদশ অধ্যায়]

কোন কিছুতে যদি অহিংসার প্রতিষ্ঠা হয় তো হইবে আণবিক বোমার আতঙ্কে এই কথাই না আমেরিকার বন্ধুরা বলিতে চাহিয়াছেন! হইবে মানি। তবে তাহা হইবে উহার মারকশক্তিতে বিপন্ন হতবুদ্ধি মানুষের সাময়িক বিতৃষ্ণা হইতে। এই বিতৃষ্ণা, এই নিবৃত্তি কি রকম! না, পেটুকের পিঠা-পরমান্ন খাওয়ার মত। যত পারে গিলে। তার পর হাঁসফাঁস করে, আইঢাই করে, গা বমিবমি করে। আর যাই তাহা দূর হইয়া যায় অমনি দ্বিগুণ আগ্রহে আবার গিলিতে লাগিয়া যায়। বিতৃষ্ণার ভাব কাটিয়া গেলে জগত তেমনই নব উৎসাহে আবার মারণ-কার্যে লাগিয়া যাইবে।

অনেক সময় অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের উৎপত্তি হয়। কিন্তু সে তো ভগবানের অভিপ্রায়, মানুষের নহে। মন্দের ফল মন্দ বই আর কিছুই নয়, যেমন ভালোর ফল ভাল, মানুষ এ কথাই জানে। মার্কিন বৈজ্ঞানিকদের ও সেনা-বিভাগের লোকদের দ্বারা মারণ কার্যে নিয়োজিত আণবিক শক্তি অন্য বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা লোকহিতকর কার্যে নিয়োজিত হইবে ইহা অবাস্তব কল্পনা নয়। কিন্তু মার্কিন বন্ধুদের কথার তাৎপর্য তাহা নয়। যে প্রশ্নের তাৎপর্য এরূপ সুস্পষ্ট তেমন প্রশ্ন তাঁহারা করিবেন এতটা বোকা তাঁহারা নহেন। গৃহ-দাহনকারী অগ্নির ব্যবহার করে নাশমূলক মন্দ কার্যের জন্য আর গৃহিণী নিত্য আগুন জ্বালে মানুষের পুষ্টিকর খাদ্য রন্ধনের জন্য।

যে মহান্ কোমল বৃত্তি মানবজাতিকে যুগযুগান্তর ধরিয়া রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, আণবিক বোমা, আমি যতদূর দেখিতেছি, সেই বৃত্তি অসাড় করিয়া দিয়াছে। যুদ্ধের তথাকথিত বিধি-নিষেধের দ্বারা পূর্বে যুদ্ধ সহনীয় হইত। এখন উহার নৃশংসতা নগ্ন। যুদ্ধ একটাই

নিয়ম মানে-গণে—তাহা বল। আণবিক বোমার দাপটে মিত্রশক্তির শস্ত্রবলের জয়জয়কার (ব্যর্থই সে জয়জয়কার) হইয়াছে কিন্তু তাহার ফলে সাময়িকভাবে জাপানের নৈতিক ও ভাবগত সর্বনাশ হইয়াছে। বিনাশী রাষ্ট্রসমূহের উপর উহার নৈতিক পরিণাম কি হইবে এখনও তাহা বলার সময় হয় নাই, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে। প্রাকৃতিক শক্তি-নিচয়ের ক্রিয়া দুর্জ্ঞেয়। সদৃশ ঘটনাবলীর পরিণাম-দৃষ্টেই কেবল অজ্ঞাত রহস্য উদ্‌ঘাটন করা যাইতে পারে। যে ক্রীতদাসকে খাঁচায় পুরিবে তাহাকে বা তাহার স্থলাভিষিক্তকেও খাঁচায় ঢুকিতে হইবে। জাপান অনুচিত আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হইয়া যে সব দুষ্কৃতি করিয়াছে উহার সমর্থনে এ কথা বলিতেছি তাহা যেন কেহ মনে করিবেন না। ব্যবধানটা ছিল মাত্রার ব্যবধান। ধরা যাইতেছে যে জাপানের লোভ অধিক গর্হিত ছিল। অধিক দোষ অনধিক দোষকে জাপানের স্থানবিশেষের নরনারী-শিশুদের নির্মম-ভাবে হত্যা করার অধিকার দেয় নাই।

বোমার এই চরম নিষ্ঠুরতা হইতে স্বতঃই যে শিক্ষা আমরা পাই তাহা এই,—বোমার দ্বারা বোমার নিবৃত্তি হইবার নয়, যেমন হয় না হিংসার দ্বারা হিংসার। অহিংসার পথ আশ্রয় করা ছাড়া হিংসার হাত হইতে বাঁচার উপায় নাই। ভালবাসাই একমাত্র শক্তি যাহা দ্বেষ জয় করিতে পারে। প্রতিহিংসায় হিংসার পরিধি ও গভীরতা বাড়ে। যে কথা আমি পূর্বে বহুবার বলিয়াছি এবং কথনানুরূপ আচরণ করার ঐকান্তিক চেষ্টা করিয়াছি সে কথারই পুনরাবৃত্তি করিতেছি। প্রথম যখন ঐ কথা বলি তখনও নূতন কিছু বলি নাই। আদিম যুগ হইতে তাহা চলিয়া আসিয়াছে। পুঁথির নীতিবাক্য আমি আওড়াই নাই; জীবনের অণু-পরমাণুতে যে কথা বিশ্বাস করিয়াছি তাহাই বলিয়াছি। জীবনের নানা ক্ষেত্রে ষাট বছরের আচরণে সেই বিশ্বাস সমৃদ্ধ ও বন্ধুদের অভিজ্ঞতা

হইতে অধিকতর দৃঢ় হইয়াছে। কিন্তু একমাত্র মৌলিক সত্য আশ্রয় করিলেই মানুষ অটল দৃঢ় থাকিতে পারে। মুক্ষমূলর বহুদিন পূর্বে যে কথা বলিয়াছিলেন সে কথা আমি বিশ্বাস করি ঃ অবিশ্বাসী যতদিন থাকিবে ততদিন সত্যের পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন থাকিবে।

[হরিজন, ৭-৭-৪৬]

৪১

জগৎ-শান্তি

ইউরোপ আজ ভগবত বা খ্রীষ্টভাবের ভাবুক নহে, শয়তানের ভাবে ভাবুক, ইহা আমার সুনিশ্চিত অভিমত। শয়তান যখন সাধুর ভেক নেয় তখন তাহার অশেষ সাফল্য মিলে। ইউরোপ আজ নামে মাত্র খ্রীষ্টান। সে মহাদেশে বস্তুত কুবেরের পূজা চলিতেছে। 'সূচের ছিদ্র দিয়া বরং হাতির গলা সহজ, ধনীর স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ ততোধিক দুষ্কর'—এ কথাই না যীশু বলিয়াছিলেন। তাঁহার অনুগামীরা পার্থিব সম্পদের তুলাদণ্ডে নৈতিক বিকাশের পরিমাপ করে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৮-৯-২০]

গিরি-প্রবচন (সারমন অন্ দ্য মাউণ্ট) হইতে উৎসারিত অমৃত-ধারা যত খুশী পান করিতে চান করুন কিন্তু দারিদ্র্য আপনার বরণ করিতে হইবে, অনুতপ্ত আপনার হইতে হইবে। গিরি-প্রবচন আমাদের প্রত্যেকের জন্য, সকলের জন্য উদ্দিষ্ট। ভগবান ও যক্ষরাজ—এ দুইয়ের উপাসনা এক সঙ্গে চলে না। করুণাময়, দয়াময়, সহনশীলতার মূর্তরূপ ভগবান ঐশ্বর্যের খেলা দুই দিন খেলিতে দেন। কিন্তু আমি আপনাদের বলি···ঐ মনোহারী অপিচ সর্বনাশী বৈভবের লাস্য হইতে পালাইয়া বাঁচুন।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৮-১২-২৭]

এক দিন আসিবে যখন আজ যাহারা এতেই সব সার, এতেই যথার্থ জ্ঞান মনে করিয়া নিত্য নূতন ভোগ্য বস্তুর পিছনে উন্মাদের মত ছুটিয়া চলিয়াছে তাহারা উল্টা চলিবে ও বলিবে: "আমরা এ করেছি কী!" কত সভ্যতারই না উত্থান-পতন হইয়াছে! অভ্যুদয়ের যতই বড়াই আমরা করি না কেন, তবু বারবার আমার বলিতে ইচ্ছা হয়: "এত সব কিসের জন্য?" ডারউইনের সমকালীন ওয়ালেস এমন কথাই বলিয়াছেন। বলিয়াছেন, অর্ধ শতাব্দীর এত সব অত্যদ্ভুত উদ্ভাবন ও আবিষ্ক্রিয়ার ফলে মানুষের নৈতিক স্তর এক অঙ্গুলিপ্রমাণও উঁচু হয় নাই। টলস্টয়ও এমন কথা বলিয়াছেন—জানি না তাঁহাকে স্বপ্নপ্রিয় ভাববিলাসী বলিবেন কিনা। যীশু, বুদ্ধ ও মহম্মদও অনুরূপ কথা বলিয়াছেন—তাঁহাদের ধর্মের বিপরীত ও বিকৃত আচরণ আমার নিজের দেশেই চলিতেছে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৮-১২-২৭]

স্থায়ী শান্তির সম্ভাবনায় অনাস্থা পোষণ করা মানুষের ধর্ম-পরায়ণতায় অনাস্থা পোষণ করারই তুল্য। এ যাবৎ যে সব উপায় অবলম্বিত হইয়াছে তাহা সফল হয় নাই তাহার কারণ তাহার জন্য উদ্যোক্তারা আপ্রাণ চেষ্টা করেন নাই। এই ন্যূনতার কথা তাঁহাদের কাছে ধরা পড়ে নাই। শান্তির আংশিক শর্ত পূরণে শান্তি আসার নয়, যেমন রাসায়নিক সংমিশ্রণের সকল শর্ত পূরণ না করিলে রাসায়নিক সংমিশ্র হওয়ার কথা নয়। মানবজাতির মান্য যে সব নেতার হাতে মারণাস্ত্রের চাবিকাঠি, মারণাস্ত্র ত্যাগের ফলাফল সম্যক্ বুঝিয়া তাঁহারা যদি মারণাস্ত্র পরিহার করেন তবে স্থায়ী শান্তি আসিতে পারে। সাম্রাজ্যিক অভিসন্ধি পরিহার বিনা তাহা যে সম্ভব নয় এ কথা বলাই বাহুল্য। আবার, বৃহৎ বৃহৎ রাষ্ট্র যত দিন না মনুষ্যত্ব-লোপকারী প্রতিযোগিতার পথ ও অভাববৃদ্ধির সুতরাং পার্থিব

সম্পদ আহরণের স্পৃহা পরিহার করিবে—ততদিন সম্ভবত সাম্রাজ্যিক অভিসন্ধি দূর হইবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রত্যক্ষ ভগবানে জ্বলন্ত বিশ্বাসের অভাবই সব বিপত্তির মূলে। পৃথিবীর যে সকল দেশ যীশুর বাণী অনুসরণ করার দাবি করে, যীশুকে শান্তির অগ্রদূত (প্রিন্স অব্ পীস্) বলিয়া বর্ণনা করে, পরম পরিতাপের বিষয়, তাহারা তাহাদের বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ প্রায় করে না। ইহা দুঃখের কথা যে, খাঁটি খ্রীষ্টান ধর্মবেত্তারা পর্যন্ত মনে করেন যে খ্রীষ্টের বাণী সকলের পক্ষে নয় কেবল জনকয়েক বাছা বাছা লোকের পক্ষেই আচরণীয়। মানুষের যাহা মুখ্য মুখ্য ধর্ম তাহার বিকাশ সাধন করা নেহাত দীন মানুষের পক্ষেও অসাধ্য নহে এই শিক্ষা শৈশবে আমি লাভ করি আর সে কথা যে সত্য তাহা পরবর্তী জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে দেখিতে পাইয়াছি। গুণবিকাশের সর্বজনীন সম্ভাব্যতায় মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস আছে বলিয়াই মানুষ জন্তুজগৎ হইতে পৃথক্। অন্য দেশ কি করিবে কি করিবে না সে অপেক্ষা না রাখিয়া কোন একটি দেশ যদি এই চরম ত্যাগের পথে আগাইয়া যায় তবে এই জীবনেই আমরা অনেকে বিশ্বে শান্তির সাক্ষাৎ প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাইব।

[হরিজন, ১৮-৬-৩৮]

জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা যদি অহিংসার ভাবে ভাবিত না হইয়া থাকেন তবে চিরাচরিত পথেই তাঁহাদিগকে হিংস্র গুণ্ডামির সম্মুখীন হইতে হইবে। কিন্তু তাহাতে এ কথাই প্রমাণিত হইবে যে, পশু-জগৎ হইতে আমরা বড় বেশী আগাই নাই ; উত্তরাধিকার সূত্রে ভগবানের কাছ হইতে যে সম্পদ পাইয়াছি তাহার মর্যাদা এখনও আমরা বুঝি নাই ; উনিশ শ' বছরের প্রাচীন খ্রীষ্ট-ধর্মের তথা আরও অধিক প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের, এমনকি ইসলামের শিক্ষা সত্ত্বেও

মানুষ হিসাবে আমাদের বিশেষ অগ্রগতি হয় নাই। অহিংসার কথা যাহারা বোঝে না তাহাদের হিংসা আশ্রয় করার কথা বুঝি, কিন্তু যাঁহারা অহিংসার ভাবে ভাবুক, আমি চাই, তাঁহারা সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া প্রমাণ করুন যে গুণ্ডামির সম্মুখীন হওয়ার শক্তি অহিংসার আছে।

[হরিজন, ১০-১২-৩৮]

বস্তুত হাজারো বছর ধরিয়া জগতে পাশব শক্তির খেলা চলিয়াছে আর উহার বিষময় ফল জগৎ ভোগ করিয়াছে। এ কথা অন্ধের কাছেও সুস্পষ্ট। তাহা হইতেও ভবিষ্যতে ভাল কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে। অন্ধকার হইতে যদি আলোর কিরণ ঝরে তো দ্বেষ হইতে প্রেমের ধারা বহিবে।

[দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ, পৃঃ ২৮৯]

৪২

প্রসঙ্গত

মৃত্যু

শিশু মরে, যুবক মরে, বৃদ্ধ মরে তো দুঃখে বিকল হই ; কিন্তু কেন ? প্রতিক্ষণ লোক জন্মে, লোক মরে। আসে তো আনন্দ করি, যায় তো শোক করি ; ইহা যে অবোধের কাজ তাহা আমাদের বোঝা চাই। যাহারা আত্মায় বিশ্বাস করে—আর এমন হিন্দু, মুসলমান বা পার্শী কে আছে যে করে না—তাহারা জানে যে আত্মা অবিনাশী। জীবিত ও মৃত সকলের আত্মাই সমান। সৃজন ও বিনাশের চিরন্তন ক্রিয়া অবিরাম চলিতেছে। সুখে উৎফুল্ল বা দুঃখে বিষণ্ণ হওয়ার ইহাতে কি আছে! কুটুম্বিতার পরিধি যদি কেবল নিজ দেশেও

সীমাবদ্ধ করি আর যত লোক জন্মে সবাইকে নিজ পরিবারের মনে করি তবে কত লোকের জন্মতেই না আমাদের উল্লাস করিতে হইবে! দেশে যত লোক মরে তাহাদের জন্য যদি কাঁদি তো চোখের জল কখনও শুকাইবে না। চিন্তার ধারা যদি এদিকে বহে তো সকল ভয় হইতে ত্রাণ পাওয়ার পথ সহজ হইবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৩-১০-২১]

জন্ম-মৃত্যু দুই পৃথক্ স্থিতি নয়, একই স্থিতির পৃথক্ পৃথক্ দিক। একটিতে বিষাদগ্রস্ত ও অপরটিতে উল্লসিত হওয়ার কোন হেতু নাই।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২০-১১-২৪]

অমরতা

আত্মা অবিনাশী এ কথা আমি বিশ্বাস করি। মহাসাগরের তুলনা দিতে আমার লোভ হইতেছে। সমুদ্র বারিবিন্দুর সমষ্টি, প্রতি বিন্দুর নিজ সত্তা আছে অথচ উহা সমগ্রের অংশ, 'এক এবং বহু'। জীবনরূপ অনন্ত সমুদ্রের আমরা তুচ্ছ বিন্দু। আমার ধর্ম বলেঃ জীবনপ্রবাহে, সর্ব জীবপ্রবাহে লীন হয়ে যাও; ভগবান সাক্ষী করে জীবনপ্রবাহের গরিমায় মিশে যাও আর তার গরিমাভাগী হও। জীবনের এই যে সমূহ বা প্রবাহ তাহাই ভগবান।

[ইণ্ডিয়াস কেস ফর স্বরাজ (১৯৩২), পৃঃ ২৪৫]

জীবনবীমা

আমি মনে করি যে, ভয়ের ও ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকার কারণে লোকে জীবনবীমা করে···জীবনবীমা করি তো আমার স্ত্রীপুত্র আত্মনির্ভরতা হারায়। তাহারা নিজেদের ভাবনা নিজেরা ভাবিবে এই আশা পোষণ করা হইবে না কেন? জগতের অগণিত

লোকের পরিবার-পরিজনের অবস্থা কি হয়? আমি তাহাদেরই একজন এ কথা কেন ভাবিব না? অন্য সকলের আগে আমার মৃত্যু ঘটিবে এরূপ মনে করার কি হেতু আছে? বস্তুত প্রকৃত রক্ষক সর্বশক্তিমান ভগবান, না আমি না আমার ভাই।

[আত্মকথা (১৯৪৮), পৃঃ ৩২০-২১]

লক্ষ্য ও পথ

লোকে বলে, 'যা-ই বলুন, উপায় উপায় বই আর কিছুই নয়।' আমি বলি 'যা-ই বলুন, উপায়ই সব।' যেমন ভাব তেমন লাভ। সাধ্য ও সাধনের মধ্যে কোন ভেদরেখা নাই। বিধির বিধানে সাধন আমার এখতিয়ারে (যদিও অল্পমাত্র)। কিন্তু সাধ্যের উপর হাত আদৌ নাই। যতটা পথ চলি লক্ষ্যের ঠিক ততটা কাছে পৌঁছি। ব্যতিক্রম ইহার হয় না।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৭-৭-২৪]

রাজনীতি

সত্যের সর্বব্যাপী মূর্ত বিশ্বরূপ প্রত্যক্ষ দেখিতে হইলে সৃষ্টির অধমতম জীবকেও নিজের মত ভালবাসিতে শিখিতে হইবে। এরূপ মুমুক্ষু ব্যক্তি জীবনের কোন ক্ষেত্র হইতেই দূরে সরিয়া থাকিতে পারে না। তাই সত্যের সাধনাসূত্রেই আমাকে রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইয়াছে। আর নিংসংশয়ে অপিচ নিরতিশয় বিনয়ে বলিব যে, যাঁরা বলেন রাজনীতিতে ধর্মের স্থান নাই, ধর্ম যে কি তা তাঁরা জানেন না।

[আত্মকথা (১৯৪৮), পৃঃ ৬১৫]

আমার মতে ধর্মবিরহিত রাজনীতি আবর্জনার সমান—সর্বথা পরিত্যাজ্য। দেশের ভালমন্দ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত আর যাহার

সঙ্গে দেশের ভালমন্দ জড়িত তাহা ধর্মপ্রবণ তথা ভগবতভক্তের বা সত্যের পূজারীর জীবনের অন্যতম ধ্যেয় না হইয়া পারে না। আমার কাছে ভগবান ও সত্য সমার্থবাচক শব্দ আর কেহ যদি আমায় নিশ্চিত বলিতে পারে যে ভগবান মিথ্যাবাদী বা অত্যাচারকারী তবে তাঁহার পূজায় বিরত হইব। অতএব রাজনীতিকেও আমাদের ধর্মক্ষেত্রে পরিণত করিতে হইবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৮-৬-২৫]

ভাগবত জীবন যাপন করিতে পারিতাম না, যদি-না মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্ম হইতাম ; আর একাত্ম হইতে পারিতাম না, যদি-না রাজনীতিতে যোগ দিতাম। মনুষ্যজীবনের তাবৎ ক্রিয়া এক অখণ্ড সূত্রে গ্রথিত। সমাজনীতি অর্থনীতি রাজনীতি আর নির্ভেজাল ধর্মনীতি—এ সবকে পৃথক্ পৃথক্ ছকে রাখা চলে না। আমার দৃষ্টিতে মানবকর্মই মানবধর্ম। এই ধর্ম অন্য সব ক্রিয়াকে নৈতিক ভিত্তি দান করে, যাহার অভাবে জীবন ব্যর্থ কোলাহলে ভরিয়া উঠে।

[হরিজন, ২৪-১২-৩৮]

নিয়তি

প্রশ্ন ঃ কে কখন কোথায় ও কিভাবে মরবে তা কি সর্বশক্তিমান আগেই ঠিক করে দেন ? তা যদি হয় তো অসুখ হলে আমরা বিব্রত হই কেন ?

উত্তর ঃ কবে, কোথায়, কিভাবে মৃত্যু হইবে তাহা পূর্বেই ঠিক হইয়া থাকে কিনা বলিতে পারি না। তবে এ কথা বলিতে পারি যে, গাছের পাতাটি পর্যন্ত তাঁর ইচ্ছা বিনা নড়ে না। এই বোধও আমার সুস্পষ্ট নয়। তদ্গতচিত্তে অপেক্ষা করিতেছি, আজ যাহা অস্পষ্ট কাল বা পরশ্ব তাহা সুস্পষ্ট হইবে। সর্বশক্তিমান যে আমাদের মত দেহধারী নহেন, এ কথাটা পরিষ্কার বুঝা চাই। তাঁর বা ইহা অপেক্ষা

জগতে অধিক বড় জাগ্রতশক্তি আর কিছু নাই। অতএব তিনি খেয়াল-বশে কিছু করেন না আর ঐ বিধির রদবদল বা সংশোধনের অবকাশও নাই। তাঁর সংকল্প স্থির ও অপরিবর্তনীয় ; অন্য সব কিছু প্রতিক্ষণ বদলায়। নিয়তিবাদ মানার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, অসুখ হইলে শরীর সম্পর্কে বিব্রত বোধ করা যাইবে না। অসুস্থ হওয়া তো দোষের বটেই। অসুখ উপেক্ষা করা আরও বেশী দোষের। কাল যাহা করিয়াছি আজ তাহা অপেক্ষা অধিক ভাল করিব এই চেষ্টার কোন অবধি নাই। কেন যে আমরা সুস্থ বা অসুস্থ হইয়াছি তাহার কারণ নির্ণয় করার জন্য ব্যাকুল হইব বইকি। অস্বাস্থ্য নয়, স্বাস্থ্যই প্রকৃতির বিধান। যদি সুস্থ থাকিতে বা অসুস্থ হইলে সুস্থ হইতে চাহেন তবে প্রকৃতির বিধানের খোঁজ করুন, তদনুসারে চলুন।

[হরিজন, ২৮-৭-৪৬]

প্রগতি

পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিকাশের চিরন্তন সূত্র। আমরা ভুল করি, সেই ভুল সংশোধন করি তবে না আগে বাড়ি—ইহাই প্রগতির মূল কথা। কোন ইষ্টই ছেলের হাতের মোয়ার মত ভগবানের হাত হইতে তৈরী হইয়া আসে না ; পুনঃ পুনঃ চেষ্টা, পরীক্ষা ও অসফলতার মধ্য দিয়া তাহা লাভ করিতে হয়। ব্যক্তির বিকাশের ইহাই নিয়ম। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশও ঐ নিয়মবশে ঘটে। ভুল করার অধিকার অর্থাৎ পরীক্ষা করার স্বাধীনতাই সকল প্রগতির সার্বভৌম শর্ত।

[স্পীচেস্ অ্যাণ্ড রাইটিংস অব্ মহাত্মা গান্ধী (১৯৩৩), পৃঃ ২৪৫]

কোন দেশের বিকাশ হইয়াছে অভিব্যক্তির পথে, কোন দেশের বা বিপ্লবের পথে। যেমন এইটি প্রয়োজন, তেমন ওইটি। মৃত্যু (যাহা নিত্য সত্য) ক্রান্তির উদাহরণ, যেমন জন্ম ও পরবর্তী বৃদ্ধি

মন্থর অপিচ স্থিরগতি বিকাশের। মানুষের বিকাশের নিমিত্ত জীবনের ন্যায় মৃত্যুও আবশ্যক। ভগবানের মত এত বড় ক্রান্তিকারী কখনও হয় নাই, কখনও হইবে না। মুহূর্ত-পূর্বে যেখানে শান্তি ছিল সেখানে তিনি তাণ্ডব সৃষ্টি করেন। যে পর্বতশ্রেণী সযত্নে অন্তিম ধৈর্যে নিরতিশয় নিপুণভাবে তিনি সৃষ্টি করেন, তাহা তিনি ধূলিসাৎ করিয়া দেন। আকাশের দিকে তাকাই তো আমি বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া যাই। ভারতের ও ইংলণ্ডের স্বচ্ছ নীলাভ আকাশে আমি মেঘ জমিতে ও হঠাৎ প্রচণ্ড বেগে ঝড় বহিতে দেখিয়াছি, অবাক্ হইয়া গিয়াছি। দেখিতে পাই সুনিয়ন্ত্রিত প্রগতি অপেক্ষা অত্যাশ্চর্য বিপ্লবের কাহিনীতেই ইতিহাসের পাতা পূর্ণ……।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২-২-২২]

পুনর্জন্ম

আমি জন্ম-পুনর্জন্মে বিশ্বাস করি। এই যে সব আত্মীয়তা কুটুম্বিতা, তাহা পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কারেরই ফল। ভগবানের বিধি অজ্ঞেয়। সে রহস্য ভেদ করার অনন্ত চেষ্টা হইয়াছে ও হইবে, রহস্য তবু অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইবে।

[হরিজন, ১৮-৮-৪০]

ধর্মীয় শিক্ষা

আমি মনে করি ধর্ম শিক্ষাদানের কাজ রাষ্ট্রের হাতে দেওয়া উচিত নয়। আর সে ভার বহন করার শক্তিও উহার নাই। আমি মনে করি ধর্ম শিক্ষাদানের দায়িত্ব ধর্মসংস্থাসমূহের বহন করা উচিত। ধর্ম ও নীতির খিচুড়ি পাকাইবেন না। আমার বিশ্বাস নীতিবিদ্যা মূলত সকল ধর্মেই এক। মৌলিক নীতিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য। ধর্ম বলিতে আমি মৌলিক নীতিবিদ্যা বুঝি না, বুঝি অসাম্প্রদায়িকতা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা। সরকারের সাহায্যে

পুষ্ট ধর্ম, রাজ-আশ্রিত ধর্ম হইতে আমাদের লাঞ্ছনা বড় কম হয় নাই। রক্ষার নিমিত্ত যে সমাজ বা সম্প্রদায় অংশত বা পূর্ণত সরকারের মুখাপেক্ষী তাহার বাঁচিয়া থাকার অধিকার নাই অথবা এ কথা বলাই অধিক সঙ্গত হইবে যে, তাহার ধর্ম ধর্মপদবাচ্য নয়। যাহা আমার কাছে সুস্পষ্ট সত্য তাহার সমর্থনে উদাহরণ উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

[হরিজন, ৩১-৮-৪৭]

ধর্মাদর্শ

ধর্মাদর্শের উৎকর্ষ এইখানে যে, এই দেহে সেই সকল আদর্শে পুরোপুরি পৌছানো যায় না। কারণ আদর্শ সিদ্ধ করিতে হয় বিশ্বাস দ্বারা আর এই দেহ-পিঞ্জরে থাকিয়া যদি আত্মা পূর্ণতা লাভ করিতে পারিত তবে বিশ্বাসের দৌড়ের অবকাশ থাকিত কি? অনন্তব্যাপী হওয়া আত্মার ধর্ম, সেই অনন্তব্যাপী হওয়ার অবসর আত্মার থাকিত কি? এই দেহে মানুষ যদি পূর্ণতা লাভ করিতে পারিত তবে অধ্যাত্ম-বিকাশের যাহা মূল অবলম্বন সে আদর্শ-প্রাপ্তির জন্য নিরন্তর প্রযত্ন ও নিরবচ্ছিন্ন সাধনা করার সুযোগ থাকিত কি? দেহে থাকিয়া এত সহজে যদি পূর্ণতা লাভ করা যাইত তাহা হইলে ধরা-বাঁধা কোন পথে চলার বেশী কিছু করার আমাদের থাকিত না। তদ্রূপ, কোন নিখুঁত সুন্দর আচার-বিধি যদি সকলের জন্য খাড়া করা যাইত তবে নানা মত ও নানা পথের অবকাশ থাকিত না, কেন না সেই অবস্থায় সকলকেই সর্বগ্রাসী এক ধর্ম মানিয়া চলিতে হইত।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২২-১১-২৮]

আদর্শের উৎকর্ষ উহার অসীমতায়। যদিও স্বভাবধর্মেই ধর্মীয় আদর্শসমূহ অপূর্ণ মানুষ আমাদের নাগালের বাহিরে থাকিবে, যদিও উহাদের যত নিকটেই যাই না কেন, অসীম বলিয়া উহারা ততই দূরে

সরিয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হইবে, তবুও উহারা আমাদের হাত-পা অপেক্ষাও আমাদের অধিক নিকটে, কেন না আমরা জানি যে আমাদের এই দেহ হইতেও উহারা অধিক প্রকৃত ও অধিক সত্য। নিজ আদর্শে এই যে বিশ্বাস তাহাই প্রকৃত জীবন, তাহাই মানুষের সর্বস্ব।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২২-১১-২৮]

অধিকার

কর্তব্য করিলে যথার্থ দাবি জন্মে। আমরা সকলে যদি নিজ নিজ কর্তব্য করি তবে অধিকার লাভে বিশেষ বিলম্ব হয় না। কর্তব্য না করিয়া অধিকার চাহিলে তাহা আলেয়ার মতই অলভ্য থাকিয়া যায়। যত পিছনে ছুটি তত দূরে যায়। ঠিক এই শিক্ষাই কৃষ্ণের অমর বাণীতে রূপ পাইয়াছে: "কর্মেই তোমার অধিকার, তার ফলে কখনও নহে।" কর্ম ধর্ম : অধিকার ফল।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৮-১-২৫]

গোপনতা

কিছু লুকানো পাপ, এই সিদ্ধান্তে আমি পৌঁছিয়াছি। আমরা যাহা বলি, যাহা করি ভগবান তাহা দেখেন, এই উপলব্ধি হইলে জগতের কাহারও কাছ হইতে আমাদের লুকানোর কিছু থাকে না। কারণ স্রষ্টার সম্মুখে কুকথা বলা তো দূরের কথা, কুভাবনাও পোষণ করা সম্ভব নহে। কুভাব কুকাজ কোন কিছু খোঁজে ত খোঁজে গোপনতা ও অন্ধকার। মানুষ নোংরা ঢাকিতে চায়, সে তাহা দেখিতে চায় না, ছুঁইতে চায় না, চায় দূরে রাখিতে। ইহা তাহার স্বাভাবিক বৃত্তি। আমাদের কথা সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। যে ভাবনা জগতের কাছ হইতে লুকাইতে চাই সে ভাবনা মনে স্থান দিতে নাই, এ কথা আপনাদের আমি বলিতে চাই।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২২-১২-২০]

পাপ

কৃত পাপের পরিণাম হইতে আমি বাঁচিতে চাই না, বাঁচিতে চাই পাপ হইতে। বরং এ কথাই বলা ভাল হইবে যে পাপ-ভাবনা হইতে বাঁচিতে চাই। যতদিন না সেই অবস্থায় পৌঁছিতেছি ততদিন আমার সোয়াস্তি নাই ; ঐ অস্বস্তিই ততদিন আমার সোয়াস্তি।

[মহাত্মা গান্ধীর বিচারধারা (১৯৩০), পৃঃ ৭০]

ভগবানের চোখে পাতক ও সাধক সমান। উভয়েই সমান বিচার পাইবে, ঊর্ধ্বে ওঠার বা অধঃপাতে যাওয়ার সমান সুযোগ পাইবে। দুই-ই তাঁর সন্তান, তাঁর সৃষ্ট জীব। সন্ত যদি মনে করে আমি পাপী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তো তাহার সাধুতা লয় হয়, পাপী অপেক্ষা সে হীন হয়, কারণ পাপী পাপ করে অজ্ঞানে, সন্ত করে সজ্ঞানে।

[হরিজন, ১৪-১০-৩৩]

লেশমাত্র গোপন না করিয়া আমার পাপের কথা আমি খোলা-খুলি স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু পাপের বোঝা আমার ঘাড়ে চাপিয়া নাই। ভগবানের দিকে যদি অগ্রসর হইতে থাকি আর আমি মনে করি হইতেছি তবে তাহা হইতে ক্ষতি হইবে না। কারণ তাঁর সান্নিধ্যের প্রভা, উষ্ণতা আমি অনুভব করি। কৃচ্ছ্রসাধন, উপবাস, প্রার্থনা করিলে পাপ স্খালন হইবে এই ভাব হইতে উপবাস ও প্রার্থনাদি করি তো তাহা ব্যর্থ হইবে এ কথা আমি জানি। কিন্তু এই সব যদি বিধাতার কোলে শ্রান্ত-ক্লান্ত আত্মার আশ্রয় লাভের ব্যাকুল প্রয়াস হয় আর আমি মনে করি তাহাই তবে এই সবের মূল্য অপরিসীম।

[হরিজন, ১৮-৪-৩৬]

প্রেতলোক

প্রেত-আত্মার কাছ হইতে কখনও আমি কোন বার্তা পাই নাই। এরূপ বার্তার সম্ভাব্যতাকে উড়াইয়া দেওয়ার মত প্রমাণ আমার

নাই। তবে এরূপ বার্তা সংগ্রহের বা সংগ্রহ করার চেষ্টার আমি বিশেষ নিন্দা করি। অনেক স্থলে তাহা কল্পনাপ্রসূত ও ছলনাময়। এইরূপ বার্তাপ্রাপ্তি সম্ভব এ কথা ধরিয়া লইয়া বলিব যে, এরূপ ক্রিয়া আত্মা ও মধ্যগ উভয়ের পক্ষেই হানিকর। যে আত্মাকে ডাকা হয় উহাকে পৃথিবীতে আকর্ষণ করা ও বাঁধা হয় কিন্তু পৃথিবীর বন্ধন ছিন্ন করিয়া উহার তো ঊর্ধ্বে উঠা চাই। দেহমুক্ত হয় বলিয়াই আত্মা যে অধিক পবিত্র এ কথা মনে করার কোন হেতু নাই। পৃথিবীতে থাকাকালীন যেসব দুর্বলতা উহার ছিল তাহার অধিকাংশই সে সঙ্গে লইয়া যায়। অতএব যে খবর বা উপদেশ সে দেয় তাহা ঠিক বা নির্ভরযোগ্য না-ও হইতে পারে। আত্মা পৃথিবীর সহিত যোগ স্থাপন করিতে চায়, ইহা খুশির কথা নয়। উল্টা, এরূপ অবাঞ্ছনীয় আসক্তি হইতে উহাকে মুক্ত করার চেষ্টা করা উচিত। আত্মার হানি সম্বন্ধে এই পর্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১২-৯-২৯]

যাহারা মধ্যগ হইয়াছে বা হওয়ার প্রয়াস করিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, সে অবস্থায় তাহাদের আমি বিকৃতমস্তিষ্ক বিকলবুদ্ধি বা কর্মকুশলহীন দেখিতে পাইয়াছি। এইরূপ প্রেত-বার্তা-সংগ্রাহক কোন বন্ধু লাভবান হইয়াছেন বলিয়া জানি না।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১২-৯-২৯]

কুসংস্কার

যে মুহূর্তে আমরা শুদ্ধ জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করি সে মুহূর্তে কুসংস্কার ও অবাঞ্ছিত জিনিস দূর হইয়া যায়। আমি বিশ্বাসের প্রসঙ্গ তুলিতেছি না, বলিতেছি সঙ্গত কাজ করিতে। যখনই লোকে তাহা করে, তখনই তাহাদের বিশ্বাস ঠিক পথ ধরে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১১-৮-২৭]